ছোটদের
ভারতের সাধক

শঙ্করনাথ রায়

ছোটদের
ভারতের সাধক
(১ম খণ্ড)

শঙ্করনাথ রায়
(প্র. না. ভ)

মুখার্জী ব্রাদার্স। কলকাতা-৯

নতুন সংস্করণ—আষাঢ় ১৩৮৮

প্রকাশক

সুকুমার মুখোপাধ্যায়

মুখার্জী ব্রাদার্স

১৮এ, টেমার লেন

কলকাতা-৯

মুদ্রাকর

লক্ষ্মী প্রেস

চন্দ্রশেখর চৌধুরী

১২ পটুয়াটোলা লেন

কলকাতা ৯

প্রচ্ছদশিল্পী

খালেদ চৌধুরী

সম্পাদনা

সরিৎশেখর মজুমদার

দশ টাকা

ভবিষ্যতে দেশ গড়বে যারা,
সেই সব ছেলে মেয়েদের হাতে
—শঙ্করনাথ

সূচীপত্র

নিবেদন

মনীষী লেখক শঙ্করনাথ রায়ের 'ভারতের সাধক' বাংলা সাহিত্যের এক মূল্যবান সংযোজন। তাঁর এই মহান্ সাহিত্যকৃতি ইতিমধ্যেই দেশের বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকা ও সুধী সমালোচকদের আন্তরিক অভিনন্দন লাভ করেছে, ধন্য হয়েছে সাহিত্যরসিক পাঠকদের সমর্থনে। সর্বোপরি ১৩৭৩ সালের রবীন্দ্র-পুরস্কারের সম্মান এই গ্রন্থের খ্যাতিকে আরো সুপ্রতিষ্ঠ করে তুলেছে।

তের খণ্ডে বিভক্ত ঐ গ্রন্থে ভারতের বিভিন্ন পন্থী সাধকদের জীবনকথা, আদর্শ ও তত্ত্ব বিবৃত। এঁদের ভেতর রয়েছেন যোগী, বেদান্তী, তান্ত্রিক ও মরমীয়া প্রভৃতি। এই সব ত্যাগী ও আদর্শনিষ্ঠ সাধকদের ধ্যানধারণা, সাধনা ও সিদ্ধি হচ্ছে ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রধান উৎস। এই উৎস থেকে আমাদের অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়েরা প্রাণশক্তি আহরণ করুক এবং দেশের মানসিক ও আত্মিক পুনর্গঠন ত্বরান্বিত হোক, এটা আমাদের সকলেরই কাম্য।

ছোটদের শিক্ষা ও মানস উন্নয়নের জন্য ভারতের সাধক-এর একটি সহজ ও সংক্ষেপিত সংস্করণের প্রয়োজনীয়তা এতদিন অনেকেই অনুভব করেছিলেন। এই প্রয়োজন মেটাবার জন্যই আমরা এই সমাজ-কল্যাণকর প্রকাশনাটি নিয়ে আজ এগিয়ে এসেছি। এটি ছোটদের উপকারে এলে আমাদের শ্রম সার্থক জ্ঞান করবো। ইতি—

প্রকাশক

গৌতম বুদ্ধ

হিমাচলের সানুদেশে, আধুনিক নেপালের দক্ষিণে ছিল কপিলাবস্তু নগর। শাক্যবংশের গৌতম-গোত্রীয় ক্ষত্রিয়েরা এখানে বাস করতেন। এঁদের গোষ্ঠীপতি ছিলেন রাজা শুদ্ধোদন। রানীর নাম মায়াদেবী। রাজ্যের আয়তন তেমন বড় নয়, লোকসংখ্যাও দশ লক্ষের বেশী নয়, কিন্তু সুখ শান্তি ও প্রাচুর্যের যেন এখানে সীমা নেই। কারণ শাল-সেগুনের বনানী বেষ্টিত এই রাজ্যের সমতল ভূমি বড় উর্বর, আর এর রাজা বড় ধর্মাত্মা ও ন্যায়বান। এমন দেশে, এমন রাজার ঘরে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন সিদ্ধার্থ, পরবর্তী কালে যিনি গৌতম বুদ্ধ নামে জগদ্বিখ্যাত।

৫৬৪ খৃষ্টপূর্বাব্দের বৈশাখী পূর্ণিমা। অন্তঃসত্ত্বা রানী মায়াদেবী সখীদের নিয়ে লুম্বিনী কাননে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না উপভোগ করছিলেন। সঙ্গিনীদের নৃত্যগীত ও কলগুঞ্জনের সঙ্গে মিশে গেছে রোহিনী নদীর কুলুকুলু নাদ, ফুলের গন্ধ মিশে গেছে চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয়। এমন শুভলগ্নে লুম্বিনী কাননে রানী মায়াদেবী প্রসব করলেন এক পুত্রসন্তান। পূর্ণিমার চন্দ্রের মত দিব্যকান্তি অনিন্দ্য-সুন্দর এই নবজাত শিশু। সারা কপিলাবস্তু নগরে আনন্দের উত্তাল ঢেউ এলো। শাক্য শুদ্ধোদনের দুই রানী—মায়া ও মহাপ্রজাবতী—এতদিন কারো সন্তান হয়নি। কিন্তু এতদিনের অভিষ্ট এবার সিদ্ধ হলো। তাই নবজাত শিশুর নাম রাখা হলো সিদ্ধার্থ। পরে আরও একটি নামে পরিচিত ছিলেন তিনি। সে-নাম গৌতম। অর্থাৎ যাঁর গোত্র গৌতম।

রাজপুত্র জন্মেছেন। রাজা শুদ্ধোদন তৎক্ষণাৎ কোষ্ঠীবিচারকদের

ডেকে পাঠালেন। তাঁদের প্রতি আদেশ হলো, নবজাতকের ভাগ্য নির্ণয় করো। গণনার পর সকলেই বললেন: মহারাজ! কুমার এক অসামান্য পুরুষ হবেন। সংসার ত্যাগের যোগ রয়েছে। সংসার ছাড়লে তিনি হবেন শক্তিমান ধর্ম প্রবর্তক। সংসারজীবনে আবদ্ধ থাকলে হবেন সুযোগ্য রাজচক্রবর্তী!

কোষ্ঠীফল শুনে শুদ্ধোদন বিষণ্ণ হলেন। সাতদিন পর আর এক দুর্দৈব নেমে এলো, রানী মায়াদেবী মারা গেলেন। রাজা শোকসাগরে ডুবে গেলেন। কে তাঁর এই নবজাত শিশুকে পালন করবে?

শুদ্ধোদনের দুশ্চিন্তা লাঘব করলেন রাজমহিষী গৌতমী। তিনিই শিশুর ভার গ্রহণ করলেন।

কিছুদিন পরের কথা। শিশুকে কোলে নিয়ে রাজা বসে-ছিলেন। এমন সময় জটাজূটসমন্বিত এক সন্ন্যাসী সেখানে এসে উপস্থিত। সন্ন্যাসীর' নাম অসিতমুনি, শক্তিধর যোগীপুরুষ। রাজা শুদ্ধোদন মুনিবরকে স্বাগত জানালেন, কিন্তু তিনি তখন একদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন অপরূপ শিশুর দিকে। দুচোখে তাঁর পুলকাশ্রু।

"মহারাজ! আপনি ভাগ্যবান। আপনার এই পুত্র বিরাট ধর্মপ্রবর্তন করে চিরস্মরণীয় হবে।" বললেন অসিতমুনি। ভবিষ্যদ্বাণী করে গেলেন তিনি। কিন্তু রাজার বুক অজানা শঙ্কায় তোলপাড় করতে লাগলো।

কুমার বড় হতে লাগলো। তার শিক্ষার ভার পড়লো আচার্য বিশ্বামিত্রের ওপর। প্রতিভায় মেধাবী বালক অদ্বিতীয়। তেমনি ভাবুক আর কোমল হৃদয়। পশুপাখি মানুষ সকলের দুঃখে তার সমবেদনা।

একদিন তিনি বসে আছেন উপবনে। হঠাৎ তাঁর পদপ্রান্তে এসে পড়লো এক শরবিদ্ধ পাখি। রক্তাপ্লুত তার দেহ। কুমারের হৃদয় করুণায় গলে গেল। পাখিকে শরমুক্ত করে সেবা করতে

লাগলেন তিনি। এমন সময় তাঁর খেলার সাথী দেবদত্ত এসে দাবি জানালো: এ পাখি আমি মেরেছি। এটা আমার। আমায় দাও।

সিদ্ধার্থ ঘোর আপত্তি জানালেন। যে শরাঘাতে প্রাণনাশ করে তার প্রকৃত অধিকার, না যে বুকে তুলে নিয়ে বাঁচায় তার। প্রশ্ন করলেন তিনি।

বলাবাহুল্য, প্রাণদাতার দাবীই সেদিন জয়যুক্ত হয়েছিল।

বালক গৌতমের হৃদয় যে কত করুণাময় ছিল এই ঘটনা থেকেই তা বোঝা যায়।

আর একদিনের একটি ঘটনায় কিশোর সিদ্ধার্থের জীবনের সেই দিকটার প্রমাণ পাওয়া গেল অসিতমুনি যার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কপিলাবস্তুতে সেদিন হলকর্ষণ উৎসব। নগরের সকলেই সেদিন শস্যক্ষেত্রে মিলিত হয়েছে। সেখানে চলেছে পান, ভোজন, আনন্দ, রঙ্গ। হঠাৎ দেখা গেল সিদ্ধার্থ সেখানে অনুপস্থিত। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল, তিনি নিকটস্থ গভীর অরণ্যে এক গাছের তলায় ধ্যাননিমগ্ন। সকলে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলো, মুখমণ্ডলে তাঁর আশ্চর্য জ্যোতি। আর যেহেতু তিনি ধ্যানস্থ, বৃক্ষের ছায়া তাই তাঁকে ছেড়ে যায়নি!

দিন যায়, যায় মাস, বৎসর। কুমার এবার যৌবনে পদার্পণ করেছেন। তবু কিন্তু রাজবৈভব ও বিলাস ব্যসনে তৃপ্তি পান না। অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন দুঃখ-শোকের কালো ছায়া আর জটিল মোহ-বন্ধন। শুদ্ধোদন চিন্তাকুল হলেন। স্থির করলেন, ছেলের বিবাহ দেবেন। তাহলেই সে সংসারী হবে।

বিষয়-বিরক্ত কুমারের মনে চিন্তার তরঙ্গ উঠলো। তিনি ভাবলেন, সমাজ পরিবেশে থেকেও ত মানুষকে টেনে আনা যায় অমৃতের পথে। পিতাও তাতে তুষ্ট হবেন।

সিদ্ধার্থ বিবাহে রাজী হলেন। সাড়ম্বরে তাঁর বিবাহ হলো

পরম রূপলাবণ্যবতী যশোধরার সঙ্গে। প্রচ্ছন্ন বৈরাগ্যের ধারা বুকে নিয়ে দাম্পত্যজীবনের দশমবর্ষে যখন তিনি উপনীত, তখন একদিন ভূমিষ্ঠ হলো তাঁর পুত্রসন্তান রাহুল। জীবনের এক বৃহত্তম প্রশ্নের সম্মুখীন হলেন তিনি। নবজাত পুত্রকে এক নূতনতর বন্ধন বলে মনে হলো তাঁর। অথচ এতদিন তিনি কেবলই ভেবেছেন ত্যাগ বৈরাগ্যের কথা। দিনের পর দিন লক্ষ্য করেছেন মানুষের এই দেহটার পরিণাম। জরা, বার্ধক্য, ব্যাধি, মৃত্যু থেকে মানুষের নিষ্কৃতি কোথায়? এই দুঃখ, এই অশান্তি মোচনের উপায় কি? কোথায় জীবনের অমৃত পথ? রাজপথে জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে দেখে, শ্মশানপথ-যাত্রী মৃতদেহকে দেখে সেই-যে মনের অবস্থা হয়েছিল যুবরাজের, সেই মানসিক দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়ে উঠলো। তিনি স্থির করলেন, সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন। জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর ওপারে যে পরম অমৃতের পথ আছে তারই আবিষ্কারে বেরিয়ে পড়বেন। বাবার কাছে অকপটে সঙ্কল্পের কথা নিবেদন করলেন। সে-এক মর্মস্পর্শী দৃশ্য। অশ্রুসজল চক্ষে শুদ্ধোদন কত কাতর অনুরোধ করলেন, কিন্তু পুত্রের গতি রোধ করতে পারলেন না।

নীরব নিশীথ রাত্রি। আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা। যশোধরা নিদ্রিতা। পার্শ্বে নবজাত শিশু। মায়ের সুডৌল বাহু শিশুর মুখ-খানির একাংশ আড়াল করে আছে। ইচ্ছে হলো, রাহুলের মুখখানিতে একবার শেষবারের মত আদর এঁকে দিয়ে যান। কিন্তু না—যশোধরার ঘুম যদি ভেঙে যায়? ধীরে ধীরে কক্ষের বাইরে এলেন সিদ্ধার্থ। বিশ্বস্ত ভৃত্য ছন্দক সিদ্ধার্থের প্রিয় অশ্ব কন্টককে নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছে। সিদ্ধার্থ বাইরে এলেন, তারপর চির-দিনের জন্য কপিলাবস্তু ছেড়ে চলে গেলেন। অনুপ্রিয় নামক স্থানে ছন্দককে তিনি বিদায় দিলেন। তাঁর লক্ষ্য আপাততঃ বৈশালী। ধর্মপ্রচার বা জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনার প্রধান কেন্দ্র তখন এই নগরী। প্রবীন সাধক আচার্য আলাড়ের নিকট থেকে সিদ্ধার্থ

সাধন প্রণালী শিক্ষা করলেন। কিন্তু মুমুক্ষু জীবনের তীব্র পিপাসা মেটে কই? তিনি বুঝলেন, এখানে তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না। আচার্যের কাছে বিদায় নিয়ে পা বাড়ালেন মগধের পথে।

নৃপতি বিম্বিসারের রাজধানী রাজগৃহের উপকণ্ঠে পাণ্ডব পাহাড়ের গুহায় সিদ্ধার্থ তাঁর সাধনা আরম্ভ করেন। একদিন বিম্বিসার এই অনিন্দ্যকান্তি সন্ন্যাসীকে দেখে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন—দয়া করে আসুন, আচার্যরূপে আমার প্রাসাদে বাস করুন! সন্ন্যাসী সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন ও বলেন: নির্বাণলাভের পর একদিন আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে। সেইসময় রাজগৃহে উপস্থিত ছিলেন শক্তিমান আচার্য রুদ্রক। একদিন সিদ্ধার্থ শ্রদ্ধাভরে তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন এবং শাস্ত্র ও সাধনতত্ত্বের নির্দেশ ভিক্ষা চাইলেন। রুদ্রক তাঁর প্রতি কৃপা করলেন। আশ্রয় দিলেন। কিন্তু তবুও নির্বাণের সন্ধান মিললো না। অবশেষে পাণ্ডব পাহাড়ের নিভৃত কন্দরে সিদ্ধার্থ আরম্ভ করলেন কঠোরতম তপশ্চর্যা। সিদ্ধি লাভের পর পরম আগ্রহে তাঁর সমগ্র সত্তা তখন উদ্বেল।

এরপর সিদ্ধার্থ গয়া অঞ্চলে উপস্থিত হন। পবিত্র নৈরঞ্জনা-নদীতটে নিভৃত উরুবিল্ব বনে ধ্যানের আসন পাতলেন। প্রায় ছয় বছর কাটলো কঠোর সাধনায়। দেহ হয়ে গেল অস্থিচর্মসার ও বিকৃত। এমন শীর্ণ ও বিকৃত যে রাখাল বালকেরা তাঁকে অদ্ভুত একটা বনচর জীব মনে করে ইটপাথর ছুঁড়তো। একদিন চরম দুর্বলতার ফলে সিদ্ধার্থ অজ্ঞান অবস্থায় বনমধ্যে পড়েছিলেন। একজন রাখাল-বালক তাঁকে দুধ দিয়ে ও সেবাযত্ন করে বাঁচিয়ে তুললে। এবার সিদ্ধার্থ বুঝলেন, শরীরটার জন্য প্রয়োজনমত আহার্য ও পানীয় গ্রহণ করতে হবে।

তেমনি ধ্যান ও সাধনা চলতে লাগলো। এই সময় সুজাতা নাম্নী এক পল্লীবধূ নিয়মিতভাবে সিদ্ধার্থের চরণপ্রান্তে ভক্তিভরে পূজার উপচার ও পরমান্ন নিবেদন করতেন। সুজাতার ফলমূল ও

পায়সান্নে সিদ্ধার্থের স্বাস্থ্য ফিরে এল এবং তিনি কঠোরতম সাধনার ফলে লাভ করলেন চিরপ্রার্থিত বুদ্ধত্ব।

সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হলে পর তাঁর প্রথম ধর্মোপদেশ শোনবার সৌভাগ্য ঘটেছিল দুজন বণিকের। গহন অরণ্য মধ্য দিয়ে তাঁরা যাচ্ছিলেন। তাঁদের গাড়ির চাকা মাটিতে আটকে গিয়েছিল, বুদ্ধ তাদের সাহায্য করেছিলেন।

পরমজ্ঞান লাভ করার পর বুদ্ধ বারাণসী গেলেন, কারণ ঐ তীর্থস্থান তখন ভারতের ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। নগরীর কিছু দূরে ঋষিপত্তন, অর্থাৎ সাধুসন্ন্যাসীদের সাধনভজনের স্থান। তারই একটি বন মৃগদাব। সেখানে বুদ্ধ আসন পাতলেন। এই স্থানটি পরে সারনাথ নামে পরিচিত হয়। সারনাথকে কেন্দ্র করে বুদ্ধের প্রচারকার্য শুরু হয়ে গেল। অনেক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি বিলাস-ব্যসন ছেড়ে তাঁর কাছে আশ্রয় নিলেন।

ধর্মপ্রচারকল্পে বুদ্ধ যখন রাজগৃহে গেলেন নৃপতি বিম্বিসার স্বয়ং তাঁর চরণে নতি জানান। বিম্বিসারের আনুগত্য ও সহযোগিতা বুদ্ধের ধর্মপ্রচারে শক্তিসঞ্চার করে। ইহা ছাড়া তিনি যে দুইজন শিষ্যকে এইসময় লাভ করেন তাঁদের নাম সারিপুত্ত ও মৌদগল্যায়ন।

প্রচার ও পরিব্রাজনের পথে বুদ্ধ তাঁর জন্মস্থান কপিলাবস্তু নগরে উপস্থিত হন। পিতা শুদ্ধোদন, বিমাতা গৌতমী, স্ত্রী যশোধরা ও পুত্র রাহুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও স্ত্রী পুত্রকে স্বধর্মে দীক্ষিত করেন। কপিলাবস্তুর সেদিনকার সেই দৃশ্য ছিল যেমন করুণ, তেমনি মধুর। বিমাতা গৌতমীর পুত্র নন্দের ঘটনাটি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নন্দ বয়সে তরুণ, একটি আত্মীয়ের মেয়েকে সে ভালবাসে। তার নাম জনপদকল্যাণী। বুদ্ধ রাজপুরীতে ঘোরাফেরা করতে করতে একসময়ে তাঁর হাতের ভিক্ষাপাত্রটি নন্দের হাতে তুলে দিলেন। তারপর সেটি ফেরত নেবার কোন লক্ষণই আর দেখালেন না। অগত্যা নন্দ অনুগতের মত তাঁর অনুসরণ

করতে লাগলেন। বুদ্ধ রাজপথ দিয়ে চলেছেন, পিছনে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে নন্দ। বাতায়ন থেকে এই দৃশ্য দেখলো জনপদকল্যাণী। তার বুক কেঁপে উঠলো। তবে কি নন্দ গৃহত্যাগ করে ভিক্ষু হলো ?

আর্তস্বরে ডাকলো জনপদকল্যাণী, ওগো, তুমি ফিরে এসো, ফিরে এসো !

নন্দের ইচ্ছা হলো, ছুটে ফিরে যান তার কাছে। কিন্তু পারলেন না। ইন্দ্রজালমুগ্ধের মত ভিক্ষাপাত্র নিয়ে চলমান বুদ্ধের সৌম্যসুন্দর মূর্তিকে অনুসরণ করতে লাগলেন।

শেষ পর্যন্ত নন্দও দীক্ষিত হলেন।

একে একে কত আত্মীয়, কত বন্ধু, কত ধনী-শ্রেষ্ঠী, কত সাধারণ মানুষ বুদ্ধের কাছে শরণ নিতে লাগলেন। ক্ষৌরকারপুত্র উপালীকে স্বীয় ধর্মে দীক্ষা দিয়ে বুদ্ধ দেখালেন, তাঁর ধর্মে জাতিবর্ণের বিচার নেই।

শ্রাবস্তীর স্বনামধন্য শ্রেষ্ঠী সুদত্ত যে বুদ্ধের প্রতি কিরকম আকৃষ্ট হয়েছিলেন তা বোঝা যায় নিম্নলিখিত কাহিনী থেকে।

ধনী সুদত্তের বড় ইচ্ছা, প্রভু একবার শ্রাবস্তীতে এসে তাঁর কাছে কিছুদিন থাকুন। তাঁর ভাবনা হলো, প্রভু এলে তাঁকে থাকতে দেবো কোথায় ?

নগরের উপকণ্ঠে অবস্থিত জেতবন তাঁর উপযুক্ত আবাস হবে। কিন্তু উপবনটি রাজকুমার জেতের সম্পত্তি। সে কি হস্তান্তরে রাজি হবে ? যদি হয় তাহলে আমি কিনে নেবো।

এই কথা শুনে জেত বললেন : সুদত্ত ! আমার এ রম্য উদ্যান যদি তোমার কেনবার ইচ্ছে হয়ে থাকে তাহলে এর ওপর স্বর্ণমুদ্রা বিছিয়ে দাও। যে-পরিমাণ মুদ্রায় সব ভূমি ঢাকা পড়বে, তাই হবে এর প্রকৃত দাম।

অনাথপিণ্ডদের কাছে তখন পৃথিবীর সমস্ত সম্পদই তুচ্ছ। তিনি রাজী হলেন। এবং রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা সেখানে জড়ো করতে

লাগলেন। সুদত্তের এই রূপান্তর দেখে জেত বিস্মিত হলেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজেই স্বেচ্ছায় সেই জেতবন প্রভুর চরণে উৎসর্গ করলেন।

বুদ্ধ যে-ধর্ম প্রচার করতেন তার মূল নীতি ছিল অহিংসা। নিজের জীবনেও তিনি এই নীতি যে প্রয়োগ করতেন তা একটি ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়। কোশলরাজ্যে সে সময়ে এক দুর্ধর্ষ দস্যুর উৎপাত ছিল। তার নাম অঙ্গুলিমাল। তার অত্যাচারে রাজা-প্রজা সকলেই অতিষ্ঠ ও আতঙ্কিত। রাজা প্রসেনজিৎ তাকে দমন করবার জন্য রাজসৈন্য নিয়োগ করেও সফলকাম হন নি। একদিন রাত্রির অন্ধকারে দুর্গম বন পার হচ্ছিলেন বুদ্ধ। হঠাৎ চারদিক কম্পিত করে ধ্বনিত হলো গম্ভীর কণ্ঠের আদেশ—"থামো"। চলতে চলতেই বুদ্ধ উত্তর দিলেন,—"আমি ত' থেমেই রয়েছি, বরং তুমিই এবার থামো।" বলাবাহুল্য, বুদ্ধ তাকে বলতে চেয়েছিলেন, ওরে দস্যু! এবার তোর লুণ্ঠন অত্যাচার থামা। দস্যুটি আর কেউ নয়, অঙ্গুলিমাল। এরপর দুজনার মধ্যে কথোপকথন হয় এবং দুরন্ত অঙ্গুলিমাল সেদিন এই চীবর পরিহিত প্রেমিক সন্ন্যাসীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। মস্তক মুণ্ডন করে ভিক্ষা-পাত্র নিয়ে বুদ্ধের সঙ্গে ঘুরতে থাকে। এই শিষ্যকে নিয়ে বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনে এলেন। কথাপ্রসঙ্গে রাজা প্রসেনজিৎ অঙ্গুলিমালের অত্যাচারের কথা বললেন। বুদ্ধ সহাস্যে রাজার সামনে ভিক্ষুবেশী অঙ্গুলিমালকে হাজির করলেন। রাজা দস্যুর এই রূপান্তর দেখে তো হতবাক। প্রসেনজিৎ এই সময় অঙ্গুলিমালকে মূল্যবান পরিচ্ছেদ ও একটি সুন্দর ভবন দান করতে চেয়েছিলেন। অঙ্গুলিমাল কিন্তু সবিনয়ে তার পরিধানের ছিন্ন চীবরটি দেখিয়ে রাজাকে বলেছিলেন, মহারাজ! আমার যা প্রয়োজন তা আছে, এর বেশী আর কি দরকার!

বুদ্ধ যা প্রচার করতেন, সম্ভব হলে নিজে সেইমত আচরণ করে শিষ্যদের মধ্যে এক দৃষ্টান্ত তুলে ধরতেন। একদিন শিষ্য আনন্দের

সঙ্গে তিনি ভিক্ষুদের আবাসের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, ঘরের এক কোণে এক ভিক্ষু পড়ে আছেন, প্রায় মৃতপ্রায়। খবর নিয়ে জানলেন, তার দুরারোগ্য উদরাময় রোগ হয়েছে। মলমূত্রের দুর্গন্ধে সেখানে টেকা যায় না। বুদ্ধ নিজে তৎক্ষণাৎ তার সর্বাঙ্গ ধুয়ে মুছে ঔষুধপথ্যের ব্যবস্থা করলেন ও ভিক্ষুদের বললেন, ছ্যাখো, তোমরা সবাই ঘর সংসার ছেড়ে সঙ্ঘে প্রবেশ করেছো। কাজেই তোমরা যদি পরস্পরের সেবা-শুশ্রূষা না করো তবে পীড়িত অবস্থায় তোমাদের কি করে চলবে?

নবীন বৌদ্ধধর্মের প্রচারকার্যে বুদ্ধ অনেক বাধাবিপত্তি, বিরূপ সমালোচনা ও শত্রুতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। ঈর্ষার বশে কেউ কেউ তাঁর বিরুদ্ধে সুন্দরী ও চিঞ্চা নাম্নী পরমাসুন্দরী ভ্রষ্টা নারীদের নিয়োজিত করে। তাদের এই কলঙ্কলেপন প্রচেষ্টা অবশ্য প্রতিবারই ব্যর্থ হয়ে যায়। নারীর মোহ থেকে বুদ্ধ নিজেকে যেমন দূরে রাখতেন, ভিক্ষুদেরও সেইরকম উপদেশ দিতেন। একবার এক ভিক্ষু রাজগৃহ-নগরে গণিকা শ্রীমতীর রূপে আকৃষ্ট হয়ে প্রায় আত্মহারা হয়। বুদ্ধ তা লক্ষ্য করেন। সেই শ্রীমতী যখন মারা যায়, এবং তার গলিত দেহে পোকা কিল্‌বিল্‌ করতে থাকে, তখন বুদ্ধ সেই মোহান্ধ ভিক্ষুকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে যান এবং তাকে বুঝিয়ে দেন, রূপলাবণ্যের মোহ কত ভুল। মানুষের দেহ অনিত্য, এই সংসার অনিত্য, অতএব ওতে আকৃষ্ট হওয়া ভ্রম।

এই সূত্রে কিসা-গৌতমীর কাহিনীটিও উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধ তখন শ্রাবস্তী নগরের এক সঙ্ঘারামে অবস্থান করছেন। কিসা-গৌতমীর ছেলে মারা গেছে। শোকে পাগল হয়ে সে ছুটলো বুদ্ধের কাছে। তাঁর পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে শোকাতুরা কিসা বললেন, প্রভু! আপনার অলৌকিক শক্তি দিয়ে আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে তুলুন। আর, তা যদি না পারেন তবে কিসের আকর্ষণে মানুষ সর্বস্ব ত্যাগ করে, আপনার মত ভিখারী সাজবে?

বুদ্ধ শান্তকণ্ঠে বললেন, ভগ্নি! তোমার মৃত পুত্রকে আমি বাঁচিয়ে তুলবো কিন্তু তার আগে তোমায় একটা কাজ করতে হবে। এমন কোন গৃহ থেকে এক মুঠি সর্ষে তুমি নিয়ে এসো, যে গৃহে মানুষ কোনদিন মরেনি, শোকের ছায়া যেখানে পড়েনি।

বুদ্ধের এই কথা শুনে কিসা-গৌতমী তখনই চোখের জল মুছে ছুটলেন দ্বারে দ্বারে, ফিরলেন পথশ্রমে অনাহারে অবসন্ন দেহে—কিন্তু হায়! এমন ঘর ত' একটাও পেলেন না! মানুষের জীবন যে অনিত্য এই মূল কথাটি গাঁথা হয়ে গেল তার অন্তরে। ফিরে এসে বুদ্ধের শ্রীচরণে আছড়ে পড়ে এইবার কিসা গৌতমী যা চাইলেন তা পুত্রের জীবন ভিক্ষা নয়, নিজের মুক্তিভিক্ষা।

বুদ্ধ ছিলেন অক্লান্ত কর্মযোগী। প্রচার ও পরিব্রাজনে একদিনের জন্যও তাঁর উৎসাহের অভাব দেখা যায়নি। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর তিনি সারা উত্তর ভারতের জনজীবনের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। আনুমানিক ৪৮৩ খৃষ্টপূর্বাব্দের কথা। পরিব্রাজনের পথে পড়ে পারাগ্রাম। বুদ্ধের গৃহী ভক্ত চুন্দ কর্মকারের বাস এইস্থানে। চুন্দের আম্রকাননে বুদ্ধ শিষ্যদের সঙ্গে আশ্রয় নিলেন। ভক্ত চুন্দ প্রভুর জন্য আহার্য বন্দোবস্ত করলেন শূকরাকৃতি কন্দ। তাঁর বৃদ্ধ অসুস্থ শরীরের পক্ষে সে-খাদ্য ক্ষতিকর, কিন্তু পাছে চুন্দ মনে কষ্ট পায় এই বিচারে বুদ্ধ সেই ব্যঞ্জন সানন্দে খেলেন। তারপর আবার শুরু করলেন তাঁর পথযাত্রা। রোগজর্জর ক্ষীণ দেহ নিয়ে অতি কষ্টে এগোলেন। ককুধ নদীতে স্নান সেরে শিষ্য আনন্দকে ডেকে বুদ্ধ বললেন: আমার ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু এজন্য চুন্দকে কেউ যেন দোষী না করে। সুজাতার পায়সান্ন খেয়ে আমি নির্বাণলাভে সমর্থ হয়েছিলাম, এবার চুন্দের ব্যঞ্জন খেয়ে আমি এগিয়ে যাচ্ছি মহাপরিনির্ব্বাণের দিকে।

স্বচ্ছতোয়া হিরণ্যবতী নদীর ওপারে কুশীনগর। সেখানে পৌঁছে বুদ্ধ শয্যা নিলেন শালবনে। প্রভুর অন্তিম সময়ের করুণ দৃশ্য দেখে

আনন্দ কাঁদতে লাগলেন। বুদ্ধ তাঁকে আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন: আমি সারাজীবন ভরে তোমাদের বলেছি, শিক্ষা দিয়েছি, এ-দেহ নশ্বর। তবে কেন কাঁদছো? নির্বাণলাভের জন্য যত্নবান হও। এই ছিল আমার প্রথম কথা। এই আমার শেষ কথাও!

লুম্বিনীর শালকুঞ্জের তলে আশী বৎসর বয়সে কুশীনগরের মল্লশালবনে মহাপরিনির্বাণ লাভ করলেন কপিলাবস্তুর রাজপুত্র মহাত্যাগী কর্মযোগী বুদ্ধ। তিনি চলে গেলেন কিন্তু বৌদ্ধধর্ম সাধারণ মানুষকে এমন আকৃষ্ট করলো যে ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে গেল তার প্রভাব।

মহাবীর তীর্থংকর

জৈন ধর্মগ্রন্থে ঋষভদেব থেকে শুরু করে পার্শ্বনাথ পর্যন্ত এই তেইশ-জন বিখ্যাত তীর্থংকরের বিস্তৃত উল্লেখ আছে। ধর্মগ্রন্থে এঁদের সকলের ভূমিকা মানব-মুক্তিদাতা হিসাবে প্রসিদ্ধ। শাস্ত্রগ্রন্থে মহাবীরের স্থান এই তেইশজন তীর্থংকরের পর, যদিও তাঁর জীবনের কাহিনী ইতিহাসের পাতায় নূতন কোন দীপ্তিশালী অধ্যায় সৃষ্টি করতে পারে নি।

মহাবীরের পিতার নাম সিদ্ধার্থ। বৈশালীর কুণ্ডগ্রামে ষষ্ঠ শতকের শেষ পাদে তাঁর জন্ম হয় (৫৯৯ খ্রীঃ পূঃ)। তাঁর পিতা ছিলেন ওই অঞ্চলের এক মহাপ্রতাপশালী ক্ষত্রিয় নরপতি। তাঁর মাতার নাম ত্রিশলা। এই ভক্তিমতী ও দয়াবতী নারীর পিতৃকুলে সেকালের অনেক প্রতাপশালী নরপতির জন্ম হয়। তাঁরা সবাই উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে রাজত্ব করতেন। উত্তরকালে মহাবীর যখন সন্ন্যাসী তখন তাঁর পরহিতকর কাজের প্রধান সহায় ছিলেন তাঁর মাতৃকুলের এই সব রাজারা।

শিশুকাল থেকেই তিনি দেখে এসেছেন যে গৃহী হলেও ধর্ম-সাধনার ক্ষেত্রে তাঁদের পরিবারের এক বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। জৈন সাধু-সজ্জনরা প্রায় প্রতিদিনই তাঁদের গৃহে আসতেন এবং ধর্মের নিগূঢ়তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতেন। মহাবীর এই জাতীয় আলোচনায় নির্বাক শ্রোতা হয়ে যোগদান করতেন। তাই শিশুকাল থেকেই তাঁর মনে অধ্যাত্ম বিশ্বাস মুকুলিত হতে থাকে। এই সময়েই এক পরম রূপলাবণ্যবতী কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের কিছুকাল পরেই তিনি এক কন্যাসন্তান লাভ করেন।

ঋষভদেব থেকে পার্শ্বনাথ অবধি মহাত্মাদের জীবনতত্ত্ব ব্যাখ্যা ও আলোচনার ফলে মহাবীরের আধ্যাত্মিক চেতনা বিকশিত হতে থাকে অল্প বয়স থেকেই। তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেন যে, এই জড়জীবন যাপনে সত্যকার মুক্তি নেই। ভোগ-বিলাসের উপকরণগুলি যেন সদাই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তাই তিনি মনস্থ করলেন শ্রমণ-ধর্মে দীক্ষা না নিলে সংযম ও ত্যাগের ভিতর দিয়ে জীবনকে গড়ে না তুললে এই সব ভোগ বিলাসের প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করা যাবে না। সুতরাং পিতা-মাতার লোকান্তরের পর তিনি আর অপেক্ষা করলেন না। মুক্তি সাধনার পথে বেরিয়ে পড়ার মনস্থ করলেন। আসন্ন বিচ্ছেদের কথা চিন্তা করে আত্মীয়-পরিজনদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল, কিন্তু মহাবীর তাঁর সযত্ন-লালিত সঙ্কল্পের পথ থেকে সরে এলেন না।

অগত্যা গ্রামের প্রান্তে ষণ্ডবনে সামান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। দীক্ষান্তে মহাবীর তাঁর সঙ্কল্পের কথা সবাইকে জানালেন। উচ্চারিত হলো নবীন সন্ন্যাসীর সঙ্কল্প-বাণী।

—'আজ হতে আমি কায়-মন-বাক্যে অহিংস, সত্য ও কঠোর ব্রহ্মচর্যের ব্রত পালন করব। সমস্ত পার্থিব ভোগ-বিলাস ত্যাগ করব এবং সংযম ও কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্য দিয়ে মোক্ষ ও সাধনার পথে অগ্রসর হব। আমার এ সাধনা সফল হবে তখনই যখন এক সুমহান মুক্তির আদর্শে ভোগলিপ্সু মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারব।'

সঙ্কল্পবাণী ঘোষণার পর তিনি সহস্র সহস্র শোকাচ্ছন্ন নর-নারীর কাছে বিদায় চেয়ে পরিব্রাজনের পথে বের হয়ে পড়লেন। এই বিঘোষিত সঙ্কল্পের পথে মহাবীর অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অনুগমন করেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে এই পথেই ঘটবে তাঁর আত্মদর্শন। সুতরাং এই পথ থেকে তিনি কোনদিন বিচ্যুত হন নি। এই অধ্যাত্ম-সঙ্কল্প পুরোভাগে রেখে একনিষ্ঠ-চিত্তে মহাবীর তাঁর আত্মদর্শনের পথে অগ্রসর হয়েছেন।

এই সময় থেকে প্রায় বৎসরাধিক কাল তিনি কয়েকজন নিগ্রন্থ শ্রমণের সাহচর্যে আসেন। এবং এঁদের নিকট থেকেই মূল্যবান নির্দেশ লাভ করে তিনি ভিক্ষু-সন্ন্যাসীর জীবন যাপনে অভ্যস্ত হতে থাকেন। এই কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন তিনি এমন নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন যে, এক বছরের মধ্যে সামান্য পরিধেয়খানি অবধি বর্জন করেন। সে সময় দেহ ঢাকবার মত একখণ্ড বস্ত্রও তাঁর ছিল না, ছিল না একটি ভিক্ষাপাত্রও। কারও কাছ থেকে অন্নভিক্ষা করাও তিনি বন্ধ করে দেন। গৃহস্থেরা স্বেচ্ছায় কিছু দিলে তিনি তা গ্রহণ করতেন। মহাবীরের এই অত্মোৎসর্গ সকলকে স্তম্ভিত করল। কোন গৃহস্থের দ্বারে অন্নের জন্য প্রতীক্ষারত কোন ভিক্ষুক অথবা সারমেয়কে দেখলে তিনি আর সেখানে দাঁড়াতেন না।

এইরূপ আত্মমগ্ন, সমাধিস্থ মহাবীরকে দেখলে উন্মাদ বলে ভ্রম হ'ত। দুষ্ট, চপলমতি বালকেরা শুধু যে তাঁর প্রতি অবজ্ঞাসূচক মন্তব্যই করত তা নয়, অনেক সময় কুকুর লেলিয়ে দিত! এই মহান সাধককে সেদিন খুব কম লোকই চিনেছিলেন।

পরিব্রাজনরত অবস্থায় একদিন তিনি এক নগরের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে সময় তাঁর মৌনভাব। রাত্রিশেষে যাত্রা আরম্ভ করেছেন, এমন সময় নগররক্ষী তাঁকে চোর ভ্রমে বেষ্টন করল। সেদিন অসংখ্য প্রশ্নবাণ সত্ত্বেও মহাবীর আত্মসমর্থনের জন্য মৌনব্রত ভাঙলেন না। অবশেষে কোতোয়াল ও তার পারিষদ তাঁকে নির্মম-ভাবে প্রহার করে গলায় ফাঁসিরজ্জু পরিয়ে দিল। তবুও মহাবীর ব্রত ভাঙলেন না। অবশেষে, কোতোয়ালেরই ভুল ভাঙল। তাঁর মনে হলো, ইনি নিশ্চয়ই কোন উচ্চস্তরের সাধক, অন্যথায় এমন শাসন ও নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য করবার মত অমিত শক্তির অধিকারী তিনি হতেন না। সেদিন কোতোয়াল তাঁর নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করলেন এবং তাঁকে মুক্তি দিলেন।

আর একবার এমনি পরিব্রাজনকালে মহাবীর ছম্মন নামে এক

গ্রামে উপস্থিত হলেন এবং এক বোধিবৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম করতে করতে সমাধিস্থ হয়ে যান। সেই সময় গো-চারণরত এক রাখাল সমাধিস্থ মহাবীরকে উদ্দেশ করে বলল, 'ওহে! শুনছো! আমি গাঁয়ে যাচ্ছি তামাক আনতে। না ফেরা পর্যন্ত আমার এই গরুটার ওপর একটু নজর রেখ।' বলা বাহুল্য সমাধিস্থ মহাবীরের পক্ষে রাখাল বালকের এই অনুরোধ রক্ষা করা সেদিন সম্ভব হয় নি।

অল্পক্ষণ পরেই রাখাল ফিরে এল এবং দেখল তার গরুটি হারিয়ে গিয়েছে। মহাবীরের ওপর সে অত্যন্ত কুপিত হলো এবং তাঁর দুই কানে দুটি কাষ্ঠখণ্ড গুঁজে দিয়ে চলে গেল। সেদিন মহাবীর অসহনীয় বেদনা পেলেন, তবুও আশ্চর্য প্রশান্তির মূর্তি ধরে সেই অত্যাচার নীরবে সহ্য করলেন। অবশেষে একজন কৃপাপরবশ হয়ে তাঁর চিকিৎসার বন্দোবস্ত করে দেন।

এইভাবে নানা অত্যাচারের মধ্য দিয়ে মহাবীর তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন। অসীম ধৈর্য ও প্রশান্তির সঙ্গে নানা-রকম কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি তাঁর সফল-সাধনার পথে অগ্রসর হন। তাঁর স্থির প্রত্যয় ছিল যে অহিংসা ও কৃচ্ছ্রসাধনার পথ থেকে তিনি কখনও বিচ্যুত হবেন না, এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই প্রত্যয় অক্ষুণ্ণ ছিল। এই বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাসের জন্যই বোধ হয় তাঁর সমসাময়িক সাধকেরা তাঁকে 'মহাবীর' আখ্যা দেন।

যাহোক, এইভাবে দীর্ঘ দিন কঠিন কৃচ্ছ্রসাধন ও তপস্যার পর মহাবীরের 'কৈবল্য' জ্ঞান লাভ হলো। এই জ্ঞানলাভের পরই রাজা, প্রজা, জ্ঞানী, মূর্খ, ধনী, নির্ধন সবাই তাঁর পদতলে লুটিয়ে পড়ে তাঁর প্রতি তাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবদন করতে লাগল। তখন মহাবীর যেখানে যেতেন, সেখানেই দুঃখ-পীড়িত মানুষ তাঁর সান্নিধ্যে এসে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করত। এইভাবে প্রায় দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা-প্রসূত জীবনের কাহিনী মুল্যবান উপদেশের আকারে মুমুক্ষু মানুষের কাছে পরিবেশন করে এসেছেন।

তাঁর শিষ্য সেবকদের উদ্দেশ করে তিনি বলতেন, 'মুক্তির জন্য জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দুর্ভাগ্যের সঙ্গে বীর্যবানের মত লড়াই করে যেতে হবে। এর জন্য যা প্রয়োজন তা' হলো চরিত্রের দৃঢ়তা, দৃষ্টির স্বচ্ছতা এবং প্রকৃত জ্ঞানান্বেষী মন। সাধুই হও আর গৃহীই হও, আধ্যাত্মিক উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন ক্ষমা, সততা, নিষ্ঠা, ন্যায়-পরায়ণতা এবং অচৌর্যের মনোভাব। জীবনের চলার পথে এই পঞ্চমহাব্রত হবে তোমার আমরণ সঙ্গী।'

জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই অহিংসা ও ক্ষমাধর্ম তাঁর কাছে এমন মহান হয়ে দেখা দিয়েছিল। তিনি বলতেন, 'প্রত্যেক জীবের মধ্যেই আত্মা আছে। সুতরাং আত্মোপলব্ধি করতে হলে অপরের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাবনত হতে হয়। আঘাত করে, আত্মাকে ক্লেশ দিয়ে আত্মোপলব্ধি হয় না।' বলা বাহুল্য, তাঁর এই অমৃত-বাণী মানুষকে সমাজের প্রতিও কর্তব্যপরায়ণ হতে শেখায়।

প্রায় দু'যুগ আগে জন্মালেও মহাবীরকে বুদ্ধের সমসাময়িক বলাই চলে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই দুই মহান ত্যাগব্রতী পুরুষের মধ্যে কখনও দেখা হয় নি। মহাবীরের পরবর্তী যুগে যে সব শক্তিশালী জৈন ধর্মনেতা জন্মেছিলেন ভারতীয় শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁদের উপদেশামৃতের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের যে সব বিস্ময় ছড়িয়ে আছে উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, গীরনার বা মাউণ্ট আবুতে সেগুলি দর্শনেই অনুমান হয় শিল্পকর্মের বিচারে সেগুলি কত সমৃদ্ধ।

৭২ বছর বয়সে পাভাপুরী নামে বিহারের এক নগণ্য গ্রামে মহাবীর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সেদিন ছিল অমাবস্যা তিথি। মধ্যরাতের অন্ধকারে সমস্ত পৃথিবী যখন সুপ্ত, সেই পরমক্ষণেই অসংখ্য সেবক-শিষ্যদের কাঁদিয়ে মহাবীর সজ্ঞানে স্বর্গলাভ করলেন। সেদিন মহাবীরের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের বেগ দমন

করতে করতে তাঁরা বললেন, আমাদের মহান গুরু—আর—ইহধামে নেই। আমাদের অধ্যাত্ম উপলব্ধিরপথে আর কেউ আমাদের আলো দেখাবেন না। তবুও আমরা হতাশ হব না। অধ্যাত্মবাদের যে আলোকিত পথের নির্দেশ দিয়ে তিনি বিদায় নিয়েছেন সেই আলো-কানুসন্ধানই হ'ক আমাদের লক্ষ্য। দীপাবলী উৎসব পালন করে পৃথিবীর তমোনাশ করে আমরা এই অমর, অজেয় সাধুর স্মরণোৎসব করব।'

দীপাবলী আজও তাই লক্ষ লক্ষ জৈন ধর্মাবলম্বীদের কাছে এমন এক পবিত্র ও মহান উৎসব।

আচার্য শংকর

অনেক দিন আগের কথা। নর্মদা নদীর তীরে এক কিশোর বালককে দীর্ঘ-যষ্টি হাতে পদচারণা করতে দেখা গেল। বালকের মাথা নেড়া আর পরনে গেরুয়া রঙের একখণ্ড জীর্ণ বাস এই কিশোর সন্ন্যাসীকে দেখে সবাই বিস্মিত। পার্থিব সব ভোগ সুখ ছেড়ে এই বালক সন্ন্যাস নিয়েছে। কিন্তু কেন?

সেদিন বালক পদচারণা করছিল আর ভাবছিল কেমন করে প্রতাপশালী যোগী পুরুষ গোবিন্দপাদের কৃপা লাভ করা যায়। বহুদিন থেকেই তার মনের গোপন ইচ্ছা যে এই যোগী, বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব সে গ্রহণ করে।

স্বামী গোবিন্দপাদ নিকটবর্তী ওঙ্কারনাথ পাহাড়ের শীর্ষে তৃণাচ্ছন্ন এক গুহায় বাস করতেন। বালক অতঃপর পাহাড়ের মাথায় উঠল, তারপর দেখল গুহার অভ্যন্তরে স্বামীজী স্থির, অবিচল সাধনায় মগ্ন। সেই সমাহিত মূর্তি দেখে বালকটি আর স্থির থাকতে পারল না। ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই যোগী পুরুষের চরণে। তারপর আচ্ছন্নের মত স্বল্পোচ্চারণে জপে যেতে থাকে মন্ত্র॥

মহর্ষীর ধ্যান ভাঙল একটু পরে। তিনি চোখ খুলে দেখলেন এক কিশোর সন্ন্যাসী তাঁর চরণ প্রান্তে বসে মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছে। তখন সেই যোগী পুরুষ খুশী হলেন এবং বালক তপস্বীর মাথায় হাত রেখে আশীর্বচন উচ্চারণ করলেন। যোগী পুরুষ ততক্ষণে অন্তর্লোকে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখে নিয়েছেন যে এই কিশোর সন্ন্যাসী একদিন ভারতের ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর প্রতিভা হয়ে দেখা দেবে। সেদিন তাই অত্যন্ত আনন্দিত মনেই সেই কিশোরকে দীক্ষিত

করলেন। তারপর কয়েক বছর ধরে নিয়মিত অধ্যয়ন ও বেদান্ত এবং হিন্দু দর্শনের গূঢ় তত্ত্ব আহরণ করে এক অসামান্য প্রতিভা হয়ে দেখা দিল। সে সময় তার বয়স মাত্র বারো।

উত্তর কালে এই কিশোর তাপসকেই আমরা দেখি শঙ্করাচার্য রূপে। জগতের চোখে তিনি তখন এক মহান ধর্মনেতা। পাণ্ডিত্য তাঁর অগাধ, কর্মক্ষমতা তাঁর অসীম এবং সহজ টীকাকার হিসেবে প্রতিভাও অসাধারণ। তাঁর ধর্মসাধনার দুটি অঙ্গ। প্রথম হল অদ্বৈতবাদ, অর্থাৎ এক ব্যতীত ঈশ্বর নাই এই মতবাদ প্রচার। এবং দুই হল ভারতের সমস্ত সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ধর্মসাধনার পথে তাদের নিযুক্ত করা।

শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব কালটি ভারতের রাজনৈতিক জীবনের এক উল্লেখযোগ্য সময়। তিন শতাব্দী আগেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে। হূনদের আক্রমণে দেশের স্বাভাবিক অবস্থা বিপর্যস্ত। সর্বত্রই একটা সশঙ্কভাব। বৌদ্ধধর্মের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ নেই বললেই চলে। তাদের মন থেকে হিন্দুধর্মের মহিমাও বিলুপ্ত। এই যুগসন্ধিক্ষণেই শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব। তিনি প্রচার করলেন, একেশ্বরবাদের পুনরুদ্ধার প্রয়োজন। আর বর্তমানে আমরা যে ক্রিয়া-কলাপ, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি দেখি তা হল ধর্মসাধনার বাহ্যিক দিক। তিনি আরও বললেন, আমাদের যুবশক্তি দিয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সংস্কারের গণ্ডী থেকে ধর্মসাধনাকে বিচ্ছিন্ন করে, তাকে এক উচ্চতর নৈতিক আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এইভাবেই সেদিনের সেই অন্ধকার ভারতে তাঁর বাণী যথার্থ দীপশিখার মতই প্রজ্বলিত হলো।

শঙ্করাচার্যের জন্ম হয় কেরলের অন্তর্গত কালাড়ি নামে এক ছোট্ট গ্রামে। তাঁর পিতা ছিলেন একজন নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণ। নাম শিবগুরু। তাঁর মাতার নাম বিশিষ্টা। সেই গ্রামে এই ভক্তিমতী মহিলা দয়া দাক্ষিণ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। গ্রাম উপান্তের চন্দ্রমৌলীশ্বরের মন্দিরে একদিন অকস্মাৎ স্বামীস্ত্রী শুনেছিলেন মহেশ্বরের দৈববাণী: আমি

বর দান করছি। শিবকল্প মহাজ্ঞানী এক পুত্র লাভ করবে! দিকে দিকে ঘোষিত হবে তার জয়বার্তা।

শঙ্করের প্রতিভার বিকাশ হয় বাল্যকাল থেকেই। তীক্ষ্ণ মেধা-সম্পন্ন এই বালক যা পাঠ করতেন, তাই স্মরণ করে রাখতেন। যখন শাস্ত্রপাঠ করতেন, তখন তার দুরূহ অংশেরও অত্যন্ত সরল ব্যাখ্যা করতে পারতেন। কথিত আছে, মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই উপনয়নের সময়, তাঁর বেদজ্ঞান সম্পন্ন হয়। তাঁর পিতার মৃত্যু হয় অতি অল্প বয়সে। সেই বালক বয়সেই তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন যে মৃত্যু অনিবার্য এবং জগতে সবকিছুই অনিত্য বিশেষ, জীবন তো অত্যন্ত তুচ্ছ এবং ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং, মাত্র জীবনধারণের জন্য মানুষ যখন আড়ম্বর করে, তখন তা নেহাতই অর্থহীন মনে হয় তাঁর কাছে। বস্তুত, সেই সময় থেকেই সংসার ও ভোগ সুখের প্রতি তাঁর প্রবল বিতৃষ্ণা জন্মায়।

জননীর প্রতি শঙ্করের শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। দীর্ঘ সময় তিনি মায়ের সেবায় অতিবাহিত করতেন। মাতৃভক্তির উদ্দীপনায় শঙ্কর এক অলৌকিক ঘটনার সৃষ্টি করেন। মাতা বিশিষ্টাদেবী কুলদেবতা শ্রীকেশবের পূজার জন্য আলোয়াই নদীতে স্নান করতে গেলেন। বার্ধক্যে শরীর অপটু, পথশ্রমে কখন তিনি মূর্ছিতা হয়ে পড়েছিলেন। মায়ের ফিরতে দেরি দেখে শঙ্কর ছুটলেন এবং সেই দৃশ্য দেখে তাঁর দু'চোখ বেয়ে দরদর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ বালক মায়ের সেবা করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন: ভগবান! মা আমার বৃদ্ধা হয়েছেন। এ পথশ্রম আর তাঁর সহ্য হয় না। কৃপা করে তুমি আলোয়াই নদীর স্রোতধারা কিছুটা এগিয়ে দাও, আমার মায়ের তাহলে আর কষ্ট হবে না!

নিষ্কলুষ ব্রহ্মচারী বালকের সেদিনকার প্রার্থনা ভগবান শুনে-ছিলেন। অচিরেই তট ভাঙতে ভাঙতে আলোয়াই তাঁর গৃহের সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়।

এই অলৌকিক শক্তির কথা কেরলের রাজা চন্দ্রশেখরের কানে

যায়। তাঁর রাজ্যে এমন লোকোত্তর প্রতিভার আবির্ভাব ঘটেছে শুনে রাজা তাঁকে মর্যাদা দেখাবার অভিপ্রায়ে রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ জানালেন। রাজকর্মচারী ছুটলো কালাড়ি গ্রামে কিন্তু তাঁকে রাজধানীতে নিয়ে যাওয়া গেল না। শঙ্কর বললেন : মন্ত্রীবর ! আমি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, কৃপা করে আমায় রাজসভার প্রলোভন দেখাবেন না।

মন্ত্রী হতাশ হয়ে ফিরলেন। তাঁর কাছে এই কথা শুনে রাজার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। তিনি স্বয়ং কালাড়িগ্রামে এলেন এবং শঙ্করের দর্শনলাভ করে নানা তত্ত্বালোচনায় বিভোর হলেন। সর্বশাস্ত্র-পারঙ্গম এই বালকের ঐশী শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে রাজা তাঁর চরণে প্রণামী স্বরূপ সহস্র মুদ্রা রাখলেন। নিরাসক্ত শঙ্কর একটি মুদ্রাও স্পর্শ করলেন না। রাজার অমাত্যদের দ্বারাই ঐ অর্থ দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন।

সংসার ত্যাগে শঙ্কর দৃঢ়সংকল্প। কিন্তু সংসার ছাড়ার বাসনা থাকলেও তা সহজে ফলবতী হয় না। এবার সেই চেষ্টাতেই রইলো সে। সেদিনকার এক আকস্মিক বিপদের মধ্য দিয়ে জীবন-বিধাতা এনে দিলেন সেই পরম সুযোগ। মায়ের সঙ্গে শঙ্কর সেদিন নদীতে স্নান করতে গেছে। কোথা থেকে এক কুমীর এসে উপস্থিত আলোয়াই নদীতে। অতর্কিতে শঙ্করকে আক্রমণ করলো সেই কুমীর। আত্মরক্ষার জন্য জলের মধ্যে ছুটোছুটি করছে শঙ্কর আর তার পশ্চাদ্ধাবন করছে কুমীর। শঙ্কর কোনমতে এক চড়ায় গিয়ে উঠেছে, কিন্তু হিংস্র কুমীর কোনমতে তাকে ছাড়বে না, অবার গিয়েছে তাড়া করে। সে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য ! শেষ সময় বুঝি আসন্ন ! দূর থেকে শঙ্কর মাকে হাঁক পেড়ে বললো : মা ! আমি মরতে চলেছি। কিন্তু দুঃখ রইলো, আমার সন্ন্যাস নেওয়া আর হলো না। মুক্তিও ঘটলো না এ জীবনে। তুমি যদি অনুমতি দাও, অন্ত্যসন্ন্যাস নিই, ভগবানের নাম নিয়ে মৃত্যু-বরণ করি !

জননীর দুই চোখে তখন অন্ধকার। কাঁদতে কাঁদতে অনুমতি দিলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে নদীতটে লুটিয়ে পড়লো তাঁর মূর্ছিত দেহ। ইতিমধ্যে

নদীতীরে সোরগোল শুনে বহুলোক জড়ো হয়ে গেল। তারা বর্শাবিদ্ধ করলো সেই হিংস্র কুমীরকে। দেব-কৃপায় বেঁচে গেল শঙ্কর।

অন্ত্যসন্ন্যাসের কথাটি সত্যান্ধ বালকের মনে চিরদিনের জন্য গেঁথে গেল। মাকে দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিল সে: সন্ন্যাসীর পক্ষে গৃহবাস নিষিদ্ধ। কাল প্রত্যূষেই চিরতরে সংসার ত্যাগ করতে হবে আমায়!

ছেলের কথা শুনে কত কাঁদলেন তিনি। বললেন, আমি কি সত্যিই তোকে সন্ন্যাস নিতে বলতে পারি বাবা? তোর মত শিশু কঠোর সন্ন্যাসজীবন যাপন করে কি করবি বল্‌তো?

শঙ্কর মাকে বোঝালো: ছিঃ মা! সঙ্কল্পচ্যুত হওয়া কি ঠিক? মিথ্যাচারী হওয়া কি উচিত মা?

কি অদ্ভুত সংসার বিতৃষ্ণা এই শিশুর! কারুর সাধ্য হলো না তাকে সংসারে ধরে রাখার। "মাগো! তোমায় কথা দিচ্ছি, সন্ন্যাস নিই আর যেখানেই থাকি, তোমার অন্তিমকালে নিশ্চয়ই আমি তোমার কাছে উপস্থিত থাকবো, তোমার পারলৌকিক কাজে কোন বাধা হবে না মা!" মাকে বুঝিয়ে বললো শঙ্কর। বিশিষ্টা দেবীর মনে পড়লো, শঙ্করের জন্মের আগেকার কথা। সেই দৈবাদেশ আর ভবিষ্যদ্‌বাণী! আর তিনি বাধা দিলেন না। পুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণের সমস্ত কিছু উপচার জননী নিজে সংগ্রহ করলেন। এদৃশ্য দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল কালাড়ির নরনারী। শঙ্কর সর্বশাস্ত্রে নিপুণ। নৈষ্ঠিকভাবে নিজেই নিজের শ্রাদ্ধ ও বিরজা-হোম সম্পন্ন করলেন। তারপর মুণ্ডিতমস্তক বালকসন্ন্যাসী যাত্রা করলেন নর্মদার দিকে।

পরিব্রাজনের পথে সেদিন তিনি তুঙ্গভদ্রার তীরে কদম্ববন নামক অরণ্যে পৌঁছলেন। ক্লান্তদেহে এক বৃক্ষমূলে বসে দেখলেন এক অদ্ভুত দৃশ্য। একদল ব্যাঙের ছানাকে ফণা বিস্তার করে ছায়া দিচ্ছে এক বৃহদাকার সাপ। কেমন করে এমনটি সম্ভব হলো, ভাবলেন শঙ্কর। তপঃপ্রভাব নিশ্চয় এই স্থানটি পবিত্র করে রেখেছে। তিনি তখন খুঁজতে বেরোলেন, কে সেই মহাতাপস যাঁর প্রভাবে এমন অলৌকিক কাণ্ড

ঘটে। পরে শঙ্কর জানলেন এই স্থানেই প্রাচীনকালে মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম অবস্থিত ছিল।

পরবর্তীকালে শঙ্কর এইখানে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, পরে যা শৃঙ্গেরী নামে পরিচিত হয়।

দুই মাস অবিরাম চলার শেষে শঙ্কর প্রসিদ্ধ মাহিষ্মতী নগর অতিক্রম করে পৌঁছলেন ওঙ্কারনাথের দ্বীপ-শৈলে। এখানকার পর্বত গুহাতেই ঘটে তাঁর সৌভাগ্যোদয়, লাভ করেন মহাযোগী গোবিন্দ-পাদের আশ্রয়। এই অধ্যাত্ম-স্পর্শমণিই কেরলের বালক সন্ন্যাসীকে রূপান্তরিত কার! 'গুরু গোবিন্দপাদের' শ্রীচরণতলে বসে নবীন সাধক একাদিক্রমে তিন বছর কঠোর সাধনা করেন। এবং অল্প সময়েই তাঁর অসামান্য যোগসিদ্ধি ও তত্ত্বজ্ঞান আয়ত্ত হয়।

গুরু গোবিন্দপাদকে উপলক্ষ্য করে এসময় শঙ্করের যোগ বিভূতির এক চমকপ্রদ লীলা প্রকাশিত হয়।

তখন ঘোর বর্ষাকাল। অবিরাম বর্ষণের ফলে স্ফীতকায় নর্মদা হঠাৎ ভীষণ রূপ ধারণ করলো। শিষ্যেরা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন, বন্যার বেগ বাড়ছে, গুহায় সমাধিস্থ গুরু গোবিন্দপাদের জীবন না বিপন্ন হয়। গুরুর সমাধি ভঙ্গ করা যায় না, অথচ এই জলস্রোতই বা রোধ কে করবে?

শক্তিধর শঙ্কর এইসময় এক আশ্চর্য কাণ্ড করলেন। একটি মাটির ঘড়া এনে কাৎ করে রেখে দিলেন। জলরাশি স্ফীত হয়ে গুহার দ্বার-প্রান্তে আসামাত্র মৃৎকুম্ভের ভিতর ঢুকলো, আর নিমেষে অদৃশ্য হলো।

গুরু গোবিন্দপাদ পরে এই সব সবিস্তারে শুনে আশীর্বাদ করলেন শিষ্যকে।

শিক্ষা সমাপনান্তে শঙ্কর যখন জ্ঞান গরিমায় যথার্থ সমৃদ্ধ সেই সময় একদিন গুরু গোবিন্দপাদ বললেন, 'বৎস! এখন থেকে স্মরণ রেখ যে এক মহান ব্রত উদযাপনের জন্য তুমি নিযুক্ত হলে। আমি ইচ্ছা করি যে, নতুন করে তুমি ধর্মের ব্যাখ্যা রচনা শুরু কর। প্রচার কর, জগতে

এক ব্যতীত ঈশ্বর নাই। ধর্মসাধনার পথ থেকে সংস্কারের আবর্জনা দূর কর। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে শৃঙ্খলাবদ্ধ কর, তাদের ঠুলিবদ্ধ দৃষ্টি বিস্তৃত করতে সাহায্য কর। বিলম্ব ক'র না। কারণ, মুক্তি-পিপাসী মানবজাতি তোমার দিকে চেয়ে আছে। তোমার ধর্মপ্রচারের কাজ শুরু কর উত্তর ভারত থেকে।'

এরপর ধর্মনেতা হিসাবে শঙ্করের নতুন জীবন আরম্ভ হলো। এবার আর দক্ষিণভারত নয়। উত্তরভারতের পুণ্যধাম বারাণসী তীর্থে তিনি প্রচারের কাজ শুরু করলেন। বেদান্ত দর্শনে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা, তাঁর যুক্তি গ্রাহ্য মন এবং সর্বোপরি তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার কথা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। শঙ্করও স্থানীয় পণ্ডিত, দার্শনিকদের তর্কযুদ্ধে আহ্বান করে পরাস্ত করতে লাগলেন। শঙ্করের অদ্বৈতবাদের সার কথা হলো 'পরম ব্রহ্মই হলো একমাত্র সত্য, বাকী সব মায়া'। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে অদ্বৈতবাদের এই গূঢ় তত্ত্বটি বোধগম্য হলো না।

কথিত আছে, এই নবীন সন্ন্যাসীর অদ্বৈতবাদের সার কথা অবহিত হতে একদিন দেবী অন্নপূর্ণা শঙ্করের কাছে উপস্থিত হলেন। দেবী অন্নপূর্ণা বললেন, শঙ্করের প্রচারিত 'মায়াবাদ' ও 'পরমব্রহ্মতত্ত্ব' মানুষের সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। সুতরাং শঙ্কর যেন সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ব্যতীত আর কোথাও এই একেশ্বরবাদ প্রচারের চেষ্টা না করে। বলা বাহুল্য, শঙ্কর এ নির্দেশ মেনে নিলেন না। তিনি সাধারণের উপযোগী করে তাঁর তত্ত্বের ব্যাখ্যা করার কথা মনস্থ করলেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। একদিন এক শ্মশানের পাশ দিয়ে তাঁর অনুচরবৃন্দসহ শঙ্কর চলেছেন। এমন সময় তাঁর পথরোধ করে দাঁড়াল ভীমাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ এক চণ্ডাল এবং তাঁর অনুগামী এক দঙ্গল নোংরা কুকুর। শঙ্কর তখন সেই চণ্ডালকে তাঁর পথ থেকে সরে যেতে বললেন। শঙ্করের কথা শুনে চণ্ডাল উচ্চহাস্য করে উঠল। তারপর কর্কশ স্বরে বলল, তুমি কাকে

সরে যেতে বলছ। আমার দেহ না আত্মাকে? আশা করি তুমি জান যে, মানুষের আত্মা অখণ্ড আর সর্বত্র বিরাজমান। সুতরাং আত্মা কোথায় যাবে, আর কেনই বা যাবে। তাছাড়া পবিত্র আত্মার কাছে সবই নির্মল, কিছুই অশুচি নয়। খানিক থেমেই সে আবার বলল, চাঁদের আলো গঙ্গার জল ও মদ্যপাত্র উভয়েতেই সমানভাবে প্রতিফলিত হয়। কোথাও অসাদৃশ্য থাকে না। সুতরাং অশুচি বলে যদি তুমি আমার দেহ নিয়ে আমায় সরে যেতে বল, তাহলে বলব তুমি প্রলাপ বকছ। দেহের কোন স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি নেই। দেহ হলো অচেতন বস্তু। অতএব তুমি তোমার অর্থহীন অনুরোধ ফিরিয়ে নাও।'

এইভাবে কিছুক্ষণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার পর সেই চণ্ডাল কঠিন দৃষ্টিতে শঙ্করের দিকে চেয়ে রইল। অল্পক্ষণ পরে ব্যঙ্গের হাসি হেসে সে আবার বলল, 'আমার মনে হয় যে ধর্ম তুমি প্রচার করছ, তোমার জীবনে তুমি তা আচরণ করছ না। তুমি প্রচার করছ যে সবাই আমরা পরমব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম। আবার অন্যদিকে অস্পৃশ্যের সান্নিধ্যও এড়াতে চাইছ। এটা কি মস্ত অসঙ্গতি নয়? কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই চণ্ডালের দেহ রূপান্তরিত হলো এক স্বচ্ছ শুভ্র মূর্তিতে। বিস্ময়ের সঙ্গে শঙ্কর দেখলেন তাঁর সামনে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি হলেন দেবাদিদেব মহাদেব। অতঃপর শঙ্করকে উদ্দেশ করে মহাদেব বললেন, 'তাপস! ভ্রান্ত সংস্কার থেকে আপনাকে উত্তীর্ণ করার চেষ্টা কর। একেশ্বরবাদ প্রচার কর, তবে তার পূর্বে ধর্মশাস্ত্রের নির্ভুল ব্যাখ্যা রচনা কর, যাতে মানুষের ধর্মসাধনা বিপথগামী না হয়। মনে রেখ, যারা আমার ভক্ত অনুগামী, তাদের পরিত্রাণের জন্য জ্ঞানলোক অন্বেষণের ভার তোমার।'

এই নির্দেশ লাভের পর শঙ্কর কিছুদিনের জন্য হিমালয়ের উদ্দেশে যাত্রা করলেন এবং অধ্যবসায়ের সঙ্গে অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যা রচনার কাজে মনোনিবেশ করলেন। কর্ম সম্পন্ন করে যখন তিনি আবার লোকালয়ে ফিরে এলেন, তখন সেই অপূর্ব ব্যাখ্যা শুনে

লোকে বিস্মিত, মুগ্ধ হলো। ধর্মের দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের এমন সহজ ব্যাখ্যা এর পূর্বে তারা শোনে নি। ধর্মের এই নবীন ব্যাখ্যা থেকে সবাই উপলব্ধি করল যে, ধর্মের নামে যে সব আচার-বিচার চলে আসছে তা ধর্মের অঙ্গ নয়। সেদিন থেকে মানুষের হৃদয়ে শঙ্করাচার্যের আসন প্রতিষ্ঠিত হলো ধর্মনায়ক রূপে।

মাত্র ষোল বছর বয়সেই এই প্রতিভাবান ঋষি-পণ্ডিত দেশ জোড়া খ্যাতি অর্জন করলেন। যারা তাঁর অনুগামী ছিলেন তাঁরাও প্রতিভাবান এবং সবদিক পূজ্য ও মান্য চরিত্রের লোক ছিলেন। তাই শঙ্করের প্রচারিত ধর্ম সেদিন অনায়াসে ব্যাপক হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল সমস্ত ভারতবর্ষে। আচার-নিগ্রহ হিন্দুধর্ম এবং ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধধর্ম এই ব্যাপকতার ধাক্কা সামলাতে পারে নি।

পরিক্রমার পথে শঙ্কর একবার মহীষ্মতী এক নগরে এসে উপস্থিত হলেন। সেই নগরে মন্দন মিশ্র নামে একজন আচারনিষ্ঠ, দেবজ্ঞ পণ্ডিত বাস করতেন। প্রতিদিন তিনঘণ্টা করে যজ্ঞ করতেন এবং দক্ষিণ ও মধ্যভারতের অগণিত শিষ্য এই অনুষ্ঠানে উল্লসিত হত। শঙ্কর ঘোষণা করলেন সমারোহ করে অনুষ্ঠান পালন ধর্ম-সাধনার অঙ্গ নয়। মন্দন মিশ্র ছিলেন অত্যন্ত দাম্ভিক আচার্য। শঙ্করের ঘোষণা তুচ্ছ করলেন এবং তাঁকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করলেন। তিনি আরও ঘোষণা করলেন যে যদি তিনি পরাজিত হন, তাহলে শঙ্করকেই গুরুরূপে স্বীকার করে নেবেন। শঙ্কর এ প্রস্তাবে রাজী হলেন। কিন্তু সমস্যা হলো বিচারকের প্রশ্ন নিয়ে! এই দুই ধুরন্ধরের তর্কযুদ্ধে যিনি বিচারক হবেন তাঁকেও পাণ্ডিত্যে সমকক্ষ হতে হবে। অনেক চিন্তার পর শঙ্কর প্রস্তাব করলেন যে মন্দন মিশ্রের পত্নী উভয়ভারতীকেই বিচারকের পদ দেওয়া হলো। উভয়-ভারতী শুধু শাস্ত্রজ্ঞ নন, তিনি ন্যায়পরায়ণ এবং সত্যনিষ্ঠ। এই তর্কযুদ্ধ বেশ কয়েকদিন ধরে চলল। অবশেষে উভয়ভারতী শঙ্করকেই জয়ী বলে ঘোষণা করলেন। অতঃপর মন্দন মিশ্র তাঁর কথামত

শঙ্করকে গুরুরূপে স্বীকার করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু তাঁর পত্নী উভয়ভারতী স্বামীকে বাধা দিয়ে শঙ্করকে উদ্দেশ করে বললেন, 'হে আচার্য! তর্কযুদ্ধে আপনি জয়ী হয়েছেন এ কথা সত্য। কিন্তু জয় আপনার সম্পূর্ণ হয় নি। আমি এবং আমার স্বামী এক পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ। আমাদের কোন পৃথক সত্তা নেই। সুতরাং আমাকে পরাস্ত না করলে জয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।' শঙ্কর সম্মত হলেন প্রস্তাবে! কিন্তু বিস্মিত হয়ে দেখলেন উভয়ভারতী কামশাস্ত্র নির্বাচন করেছেন তর্কযুদ্ধের বিষয়বস্তু হিসাবে। নবীন সন্ন্যাসী অত্যন্ত অসু-বিধায় পড়লেন। তিনি আজীবন কুমার এবং সন্ন্যাসীর জীবন-যাপনে অভ্যস্ত। সুতরাং তর্কের বিষয় সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। শঙ্কর তাই চাইলেন যে বিষয়টি পরিবর্তিত হ'ক। কিন্তু উভয়ভারতী কঠোর-তার সঙ্গে বললেন, 'না'। কথিত আছে নিরুপায় হয়ে অগত্যা মাসাধিক-কাল সময় চাইলেন শঙ্কর। তারপর যোগবলে মৃত রাজা আম্রাকের মৃতদেহে প্রবেশ করলেন। এই মৃত রাজার দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করেই কামশাস্ত্র সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞান আহরণ করলেন। মাসান্তে যখন তিনি পুনরায় উভয়ভারতীকে আহ্বান করলেন, তখন উভয়ভারতী ভীত হয়ে বিনা তর্কেই শঙ্করকে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করে নিলেন।

মন্দন মিশ্রর পক্ষে শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণে আর কোন বাধা রইল না। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল এই কাহিনী। শিষ্যত্ব গ্রহণের পর মন্দন মিশ্রের নামকরণ হলো সুরেশ্বর আচার্য। শঙ্করের অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সনন্দন (পদ্মপাদ), টোটোকাচার্য এবং হস্তমালক আচার্য।

সনন্দন হলেন তাঁর প্রথম শিষ্য। তিনি চোল দেশের অধিবাসী। এ নবীন যুবকটি অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ এবং পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। সনন্দনের অসাধারণ যোগ ক্ষমতা এবং শঙ্করের প্রতি অবিচল ভক্তির কথা সর্বজন বিদিত। একদিন সনন্দন হিমালয়ের পথে পরিভ্রমণ করছিলেন, তখন অকস্মাৎ শঙ্কর তাঁদের স্মরণ করলেন। সনন্দন

দেখলেন এক দুস্তর গিরিবর্ত্ম্য তাঁর পথ রোধ করে আছে। সনন্দন চিন্তিত হলেন না। যোগবলে সেই গিরিপথ পার হয়ে এলেন। কথিত আছে, যখনই তিনি এই গিরিপথ অতিক্রম করেছিলেন, তখন তাঁর প্রতি পদক্ষেপে একটি করে পথ প্রস্ফুটিত হয়ে তাঁকে ধারণ করছিল। সেইজন্য সনন্দনের আর এক নাম 'পদ্মপাদ'।

পরিক্রমার পথে আচার্য শঙ্কর একবার শ্রীভালি নগরে উপস্থিত হলেন। প্রভাকর নামে এক পণ্ডিত তাঁকে স্বাগত জানাতে এলেন। প্রভাকরের সঙ্গে ছিল তাঁর একমাত্র সন্তান। সন্তানটি বোধহীন, জড় এবং বলহীন। শঙ্করের কৃপালাভের উদ্দেশেই ছেলেকে সঙ্গে এনেছিলেন প্রভাকর।

ছেলেটির দুরবস্থা দেখে শঙ্কর দুঃখিত হলেন। কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই শঙ্করের চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গভীর সমবেদনায় তিনি ছেলেটির গায়ে হাত রাখলেন, তারপর মধুর কণ্ঠে বললেন, 'পুত্র! বল তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ, কোথায় যেতে চাও? তোমার আকাঙ্ক্ষাই বা কী?'

শঙ্করের স্পর্শে যেন নতুন প্রাণ সঞ্চার হলো বালকটির দেহে। তার নির্বোধ চাহনি মুহূর্তের মধ্যে অপসারিত হলো। সারা মুখাবয়ব উজ্জ্বল হয়ে উঠল, যেন কোন এক রহস্যময় আলোকসম্পাতে মূর্ত হয়ে উঠল জীবন মৃত্যুর দার্শনিক ব্যাখ্যা, প্রবল আবেগে স্বতোৎসারিত হলো ভগবৎ স্তোত্র।

এ দৃশ্য দেখে প্রভাকর আনন্দে কেঁদে ফেললেন। শঙ্কর মধুর হেসে বললেন, 'পণ্ডিত, আর চিন্তা নেই। আপনার পুত্র এখন স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়েছে। ওর অবচেতন মনের অধ্যাত্ম বিশ্বাসকে আমি নাড়া দিয়েছি। অলৌকিক প্রতিভা বলে ও একদিন হয়ে উঠবে এক মস্ত দার্শনিক। তবে আপনার পরিবারের কোন কাজে ও আসবে না। ওকে আমায় দিন। ও আমার সঙ্গে থাকুক, আমারই বাণী প্রচার করুক।'

এই বালক উত্তর জীবনে এক মস্ত চিন্তানায়ক হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শঙ্করের শিষ্যদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ। এঁরই নাম হস্তমালক।

একদিন শঙ্কর এক নিগূঢ় তত্ত্বের দার্শনিক ব্যাখ্যায় মগ্ন। পার্শ্বচর গিরি বাদে সবাই উপস্থিত। শঙ্কর চিন্তিত হলেন। বললেন, 'গিরিকে দেখছি না কেন? এই আলোচনা সভায় তার তো অনুপস্থিত থাকার কথা নয়?'

কে একজন বললেন, 'ভগবন! গিরি আপনার ব্যবহৃত বাসন-পত্তর, কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করছেন।' শঙ্কর বললেন, তাহলে ওর না ফেরা অব্দি এ আলোচনা স্থগিত থাক।'

শঙ্করের একজন শিষ্য তখন সাহস করে বললেন, মহারাজ! আমরা সবাই জানি গিরি নিরক্ষর! ওর পক্ষে কি আজকের এই আলোচনায় যোগ দেওয়া সম্ভব?

শঙ্কর প্রশ্নকারীর দিকে না তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'গিরি নিরক্ষর একথা ঠিক। তবে গিরি অত্যন্ত পবিত্র এবং ধর্মনিষ্ঠ। আমরা যখন কোন আধ্যাত্মিক বিষয়ের ওপর গভীর আলোচনা করি, তখন গিরি এক কোণে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে আমাদের আলোচনা শোনে।

অল্প পরেই গিরি ফিরে এল। তখন শঙ্কর তাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'গিরি! বহুদিন তোমার দার্শনিক ব্যাখ্যা শুনিনি। আমরা আজ সবাই উৎসুক। আমাদের জন্য সংস্কৃত ভাষায় একটি দার্শনিক পদ রচনা করে আমাদের শোনাও।'

সবাই বিস্মিত হলেন। তাঁরা ভেবে পেলেন না, একজন নিরক্ষরের পক্ষে প্রভুর আদেশ পালন সম্ভব হবে কি করে।

কিন্তু গিরি বিচলিত হলো না। ধীরভাবে সে শঙ্করের দিকে চেয়ে বলল, 'ঠাকুর! আপনি অভ্রান্ত, আপনি ধ্রুব। যখন আপনার অভিলাষ যে আমি পদ রচনা করি, তখন নিরক্ষর হলেও আমি আপনার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করব'। এইকথা বলে গড়গড় করে সুললিত ভাষায়

নিরক্ষর গিরি পদ রচনা করে যেতে লাগল। সে সব পদের যেমন কাব্যঝঙ্কার, তেমনি দার্শনিক ব্যাখ্যা। শঙ্করের পাণ্ডিত্যাভিমানী শিষ্যের দল সে পদরচনা শুনে লজ্জায় মাথা নামিয়ে নিলেন। এই-ভাবে নানা অত্যাশ্চর্য ঘটনার মধ্য দিয়ে শঙ্কর তাঁর শিষ্যদের বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত কোন মানুষের ধর্ম-সাধনা সফল হয় না।

তাঁর চারপাশে যাঁরা থাকতেন তাঁরা সবাই ছিলেন অগাধ পণ্ডিত এবং আধ্যাত্মিকজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁর সমসাময়িক সমস্ত ঋষি, দার্শনিকের সঙ্গেই শঙ্করের সাক্ষাৎ হয়েছিল। একেশ্বরবাদ ও ব্রহ্ম-জ্ঞান সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা হিন্দুধর্মকে সেদিন নিশ্চিত ক্ষয় থেকে রক্ষা করেছিল, তাঁর পরহিতব্রত সাধারণ মানুষকে উপযুক্ত সাহস ও প্রেরণা যুগিয়েছিল। তাই সেদিন তাদের পক্ষে সংস্কারের বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়েছিল। একথা আজ জোর করে বলা যায় যে, কয়েক শতাব্দী ধরে যে অধঃপতন ও ধর্মভ্রষ্টতা হিন্দুধর্ম ও সমাজকে আবিল করে রেখেছিল, সে আবিলতা থেকে ধর্মকে মুক্ত করতে শঙ্করের রচিত ব্যাখ্যাগুলি যথেষ্ট সাহায্য করে।

শঙ্করাচার্যের সংগঠন ক্ষমতা ছিল অসাধারণ, যোগীমঠ, দ্বারকা, পুরী এবং শৃঙ্গেরিতে তিনি চারটি মঠ নির্মাণ করান। এই মঠে যাঁরা অধ্যক্ষ, তাঁরা সবাই ছিলেন উপযুক্ত পণ্ডিত। কুম্ভমেলার পুনরু-জ্জীবনের মূলেও ছিল তাঁরই প্রেরণা। এই বিরাট ধর্ম-মেলায় ভিন্ন-ভিন্ন গোত্রের কত যে সন্ন্যাসী যোগ দেন তার আর ইয়ত্তা নেই। এই ধর্মমেলার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হলো সমবেত ভাবে জনসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করা। আচার্য শঙ্করের আর একটি সৃষ্টি হলো বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের একত্রিত করে জনসেবার কাজে লাগানো।

আচার্য শঙ্কর ব্রত বিবিধ কাজ সম্পন্ন করেন অত্যন্ত অল্পসময়ে। মাত্র ৩২ বছর বয়সে এই বিরাট প্রতিভাবান মহর্ষির গৌরবময় জীবনের অবসান হয়। হিমালয়ের কোলে যখন তিনি গভীর সমাধিস্থ তখনই তাঁর লোকান্তর ঘটে। বোধহয় সেই কারণেই লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর শ্রদ্ধার চোখে তিনি হলেন শিবের অংশ-স্বরূপ।

রামানুজ

দাক্ষিণাত্যের পার্থসারথির মন্দিরে সেদিন অনেক লোক সমাগম হয়েছে। কাছেই কৈরবিনী সাগরসঙ্গমের তীর্থ। চন্দ্রগ্রহণের সময়। পেরেমবুদুরের বিখ্যাত পণ্ডিত আসুরি কেশবাচার্যও এসেছেন সস্ত্রীক। কেশব ও তাঁর স্ত্রী মন্দির-সন্নিহিত তিরুইল্লি-কেণিতে কুমুদ সরোবরে অনুষ্ঠান করলেন এক পুত্রেষ্টি যজ্ঞ। রাত্রে কেশবাচার্য স্বপ্ন দেখলেন, ভগবান পার্থসারথি তাঁকে প্রসন্নমধুর কণ্ঠে বলছেন, "আমি বর দিচ্ছি, অচিরে তুমি এক পরমভাগবত পুত্র লাভ করবে। আত্মাভিমানী পণ্ডিতদের দমনের জন্য আচার্যরূপে হবে তার আবির্ভাব।"

বৎসর না ঘুরতেই স্বপ্নাদেশ ফলে গেল। ১০১৭ খৃষ্টাব্দে কেশবাচার্যের গৃহ আলোকিত করে শুভলগ্নে জন্ম নিল এক দিব্যকান্তি শিশু। এই শিশু উত্তরকালের বহুকীর্তিত মহাপুরুষ—আচার্য রামানুজ। বাল্যকাল থেকেই রামানুজের অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া ধর্মকথা ও সাধুসজ্জনের সঙ্গ পেলে ত কথাই নেই, বালকের কোন দিকে হুঁশ থাকে না। তাঁর জীবনে দুটি বিশেষ ধারা মিলিত হয়। শাস্ত্র-পারঙ্গম পিতার কাছ থেকে তিনি পান জ্ঞান ও কর্মের প্রবাহ, আর মাতৃকুল থেকে ভক্তি ও প্রপত্তি।

বালক রামানুজ একদিন চতুষ্পাঠী থেকে ফেরার পথে এক প্রিয়দর্শন সাধুকে জোর করে তাঁকে বাড়িতে ডেকে আনে, সেখানে আতিথ্য গ্রহণ করতে অনুরোধ করে। রাত্রে তাঁর পদসেবাও করে। ইনি হলেন সাধু কাঞ্চীপূর্ণ। শুধু একটি রাত্রের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ও অন্তরের স্পর্শ বালক রামানুজের জীবনের মূলে এক প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে যায়।

যৌবনে রামানুজ অধ্যাপক যাদবপ্রকাশের টোলে বেদান্ত শিক্ষা আরম্ভ করেন। বৈদান্তিক হিসাবে যাদবপ্রকাশের বিশেষ খ্যাতি ছিল। তরুণ গুণবান ছাত্র রামানুজ অধ্যাপকের স্নেহের পাত্র হয়ে ওঠেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল। কারণ, ভক্তিপ্রবণ রামানুজের কাছে যাদবপ্রকাশের ধর্মব্যাখ্যা সব সময় গ্রহণ-যোগ্য হতো না। অধ্যাপকের বক্তব্যকে খণ্ডন করার সময় ছাত্র রামানুজ বিস্ময়কর জ্ঞান ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতেন। যত দিন যায়, ততই ছাত্র ও অধ্যাপকের মধ্যে তিক্ততা বাড়ে এবং ঘন ঘন বিরোধ বাধে। ফলে, যাদবপ্রকাশ ও তাঁর ছাত্রের দল রামানুজের ওপর বিশেষ বিরক্ত হলেন। রামানুজের মধ্যে বেদান্তের এক শক্তিশালী শত্রুর পরিচয় পেয়ে তাঁরা স্থির করলেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। কিছুদিন পর রামানুজ সহ একদল ছাত্র নিয়ে যাদবপ্রকাশ বারাণসী তীর্থদর্শনে যাচ্ছিলেন। কয়েক সপ্তাহ পথ চলার পর তাঁরা গোণ্ডার গভীর জঙ্গলে এসে পৌঁছলেন। এইখানে তাঁরা রামানুজকে হত্যা করার সুযোগ নেবেন স্থির করলেন। তীর্থযাত্রীদের দলে রামা-নুজের এক দূরসম্পর্কীয় ভাই ছিলেন, নাম গোবিন্দ। তিনি ষড়যন্ত্রের কথা কোনপ্রকারে জানতে পারেন। সন্ধ্যাবেলা স্থানীয় এক পুষ্করিণীতে স্নান করার সময় গোবিন্দ রামানুজের কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন : ভাই, তোমার জীবন বিপন্ন। এরা স্থির করেছে আজ রাত্রে তোমায় খুন করবে। দোহাই তোমার, এক্ষুণি এই জায়গা ছেড়ে পালাও।

রামানুজ মনস্থির করে ফেললেন। নিঃশব্দে নিকটস্থ গভীর জঙ্গলে গা ঢাকা দিলেন। শত্রুরা তাঁকে খুঁজে না পেয়ে এই ভেবে নিশ্চিন্ত হলো যে রামানুজ নিশ্চয় বাঘের পেটে প্রাণ হারিয়েছে।

অবিশ্রান্ত পায়ে হেঁটে রামানুজ এক গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করলেন। এক বিরাট বটগাছের ওপর কোনপ্রকারে রাত্রি কাটিয়ে পরদিন আঁকা-বাঁকা অরণ্যপথে আরম্ভ করলেন বিপদসঙ্কুল পদযাত্রা। জল নেই,

খাদ্য নেই, মধ্যাহ্ন পর্যন্ত একটানা পথ হাঁটার শ্রান্তিতে রামানুজ এক গাছের ছায়ায় এলিয়ে পড়ে গাঢ় নিদ্রায় ডুবে গেলেন।

যখন ঘুম ভাঙলো, সামনে এক ব্যাধ ও তার পত্নীকে দেখে রামানুজ বিস্মিত হলেন। স্নেহস্নিগ্ধ হাসিমাখা মুখে ব্যাধপত্নী বললেন: তুমি কে বাবা? এমন জায়গায় তুমি কেমন করে এলে? এই গভীর জঙ্গল সাপ আর বাঘে ভরা। ডাকাতরাও যে এমন জঙ্গলে আসতে সাহস পায় না!

রামানুজ সরল মনে স্বীয় পরিচয় দিয়ে বললেন: মা! আমার তীর্থসাথী বন্ধুরা আমার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়েছে। তাই আজ আমার এই অবস্থা। আমার মনে হয় আপনারা এখানকার সব কিছুই জানেন। আমায় কাঞ্চি যাবার পথ দেখিয়ে দেবেন?

—চিন্তিত হয়ো না বাছা! আমরাও সেখানে যাবো। তুমি আমাদের সঙ্গে এসো!

ব্যাধপত্নী রামানুজকে সস্নেহে কিছু মিষ্টি ও সরস ফল খেতে দিলেন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি সব মুছে গেল রামানুজের। তারপর তাঁদের সঙ্গে আবার যাত্রা শুরু করলেন।

পথিমধ্যে রাত হলো। সকলে নিদ্রা গেলেন। শেষরাত্রে ফিস্-ফিস্ শব্দে রামানুজের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি শুনতে পেলেন ব্যাধ-পত্নী বলছেন: আমার বড় তৃষ্ণা পেয়েছে। একটু জল এনে দাও না। ব্যাধ বললো: তুমি কি পাগল হলে? এই রাত্রে গভীর জঙ্গলে তোমার জন্য জল কোথা থেকে আনবো? কোনরকমে সহ্য করে থাকো। ভোর হলে জল এনে দেবো।

এইসব শুনে রামানুজ বিচলিত হয়ে উঠলেন। ইনি আমার প্রতি এতো সদয় হয়েছেন, এতো স্নেহ করেছেন, আর আমি ওঁর এই কষ্ট দেখেও চুপ করে থাকবো? রামানুজ মনস্থির করে ফেললেন, বললেন, মা! আমি জল আনছি। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই একথা শুনে বিশেষ লজ্জিত হলেন, আপত্তি করতে লাগলেন, কিন্তু রামানুজ কর্ণপাত

না করে জলের সন্ধানে রওনা হলেন। কয়েক শত গজ দূর যেতে না যেতেই অরণ্য শেষ হলো এবং নিকটবর্তী একটি কূপে বহু লোককে জল তুলতে দেখে রামানুজ আনন্দে আত্মহারা হলেন। তাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : এ স্থানের নাম কি ? স্থানীয় লোকেরা ফিক্‌ফিক্ করে হাসতে লাগলেন।—ভারি আশ্চর্যের বিষয়, আপনি এমন প্রশ্ন করছেন ? আপনি যাদবপ্রকাশের ছাত্র রামানুজ না ? আপনি নিজের দেশ কাঞ্চিকেই ভুলে গেছেন ? এই দেখুন সেই বিখ্যাত শাল কূপ, এইখানকার জলই বরদরাজ মন্দিরে যায়।

একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন রামানুজ। এতো তাড়াতাড়ি আমি কাঞ্চি পৌঁছে গেলাম কিভাবে ? এক রাত্রেই মধ্যপ্রদেশের গোণ্ডা অরণ্য পার হলাম কি করে ? এ যে অসম্ভব কাণ্ড !

যাহোক্, কূপের জল নিয়ে রামানুজ ব্যাধপত্নীর কাছে ফিরে গেলেন। সানন্দে সেই জল পান করে তিনি বললেন, আরও খানিক জল এনে দাও বাবা ! রামানুজ আবার রওনা হলেন। পাত্রপূর্ণ জল নিয়ে ফিরে এসে কিন্তু তিনি আর সেই ব্যাধ দম্পতিকে দেখতে পেলেন না। বিস্ময়ের সীমা রইলো না তাঁর। কোথায় গেলেন তাঁরা ? তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন তাঁদের, কিন্তু আর দেখা পেলেন না। এমন আকস্মিক অন্তর্ধানের কোন ব্যাখ্যাই খুঁজে পেলেন না রামানুজ। সেই স্নেহপরায়ণ ব্যাধ দম্পতির করুণার কথা বার বার মনে হতে লাগলো তাঁর।

নগরে ফিরে তাঁর আবাল্যের আরাধ্য সন্ন্যাসী কাঞ্চিপূর্ণের কাছে সব কথা বললেন। সন্ন্যাসী শুনে সহাস্যে বললেন, প্রিয় বৎস ! তুমি সত্যই ভাগ্যবান। স্বয়ং ভগবান নারায়ণ ও লক্ষ্মী দেবী করুণাপরবশ হয়ে তোমায় উদ্ধার করেছেন। বাঘের মুখ থেকে বাঁচিয়ে তোমায় দেশে পৌঁছে দিয়ে গেছেন।

সন্ন্যাসীর কথা শ্রবণে রামানুজের দুই চোখে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে

পড়লো। সেইদিন থেকে তিনি ভগবান নারায়ণের মধুর স্মৃতিতে মগ্ন হলেন এবং ধর্মীয় গ্রন্থপাঠে ডুবে গেলেন।

ওদিকে তীর্থ পর্যটন করে ফিরে যাদবপ্রকাশও কাঞ্চীতে ফিরে এসে শোনেন, রামানুজ জীবিত, নিরাপদে গৃহে ফিরে এসেছে। কপট সমবেদনা দেখিয়ে যাদবপ্রকাশ তার দীর্ঘজীবন কামনা করলেন। রামানুজ কিন্তু কোনরূপ অশ্রদ্ধা না করে পুনরায় তাঁর চতুষ্পাঠীতে যাতায়াত আরম্ভ করলেন।

কিছুকাল পরের কথা। প্রসিদ্ধ ভক্তিসাধক, শ্রীরঙ্গনাথের একান্ত সেবক যামুনাচার্য একদিন কাঞ্চীনগরে এলেন এবং রামানুজের অধ্যাপক বেদান্তবিদ যাদবপ্রকাশের সঙ্গে দেখা করলেন। এই সময় রামানুজের দিব্যকান্তি ও তেজঃপুঞ্জ কলেবর দেখে তিনি আকৃষ্ট হলেন। তাঁর মনে হলো এ যুবক শ্রীহরির এক চিহ্নিত সেবক, শুষ্ক তার্কিক ও অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতের অভিভাবকত্বে এর ভক্তিধারা শুকিয়ে যায় যদি!

কিছুদিন পর জটিল তর্ক ও তুমুল বিচারদ্বন্দ্বের পর ছাত্র ও অধ্যাপকে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। রামানুজ ভাবলেন, এ ভালোই হলো, তা নয়তো ভগবৎশক্তি লোপ পেয়ে যেতো। এই খবর শুনলেন যামুনাচার্য। তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্য মহাপূর্ণকে পাঠালেন রামানুজকে ডেকে আনতে। এই সংবাদে রামানুজ নিজেকে ধন্য মনে করলেন। চারদিন পদব্রজে চলার পর কাবেরীর অপর তীরে রঙ্গনাথজীর মন্দিরে পৌঁছলেন। কিন্তু সেখানে বিরাট জনতা দেখে দুজনেই চমকে উঠলেন। যে দৃশ্য দেখলেন, তা মর্মান্তিক। বৈষ্ণবগুরু যামুনাচার্য সেই সকালেই দেহরক্ষা করেছেন। মহাপুরুষের নিষ্প্রাণ দেহকে উদ্দেশ করে রামানুজ যতবার সদ্যরচিত শ্লোক উচ্চারণ করলেন ততবার যামুনাচার্যের নিস্পন্দ অঙ্গুলিও একটির পর একটি নড়ে উঠলো। এই অলৌকিক কাণ্ডে সকলেই বিস্মিত হলেন। বুঝলেন এই দুই মহান আত্মার মধ্যে এক অলৌকিক যোগাযোগ আছে।

শ্রীরঙ্গম থেকে রামানুজ ফিরে এলেন, আবার সাধনভজনে দিন কাটতে লাগলো। কাঞ্চীপূর্ণকে বার বার অনুরোধ করলেন, আমায় আপনি দীক্ষা দিন। কিন্তু তিনি স্নেহভরে প্রত্যাখ্যান করে বললেন, বৎস! তুমি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্র, শাস্ত্রমতে আমার দীক্ষা দেওয়ার অধিকার নেই। তুমি ধৈর্য ধরো। শ্রীবিষ্ণুই তোমার চিহ্নিত গুরুকে পাঠিয়ে দেবেন।

এরপর কাঞ্চীপূর্ণ স্বয়ং একদিন স্বপ্নাদেশ পেলেন, রামানুজ যেন মহাত্মা মহাপূর্ণের আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রত্যাদেশ শুনে রামানুজের আনন্দ আর ধরে না। তিনি পাগলের মত ছুটে গেলেন শ্রীরঙ্গমে। অবশেষে একদিন মহাপূর্ণ সস্ত্রীক কাঞ্চীনগরে এসে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত করলেন রামানুজকে। নবলব্ধ গুরু ও গুরুপত্নীকে রামানুজ স্বগৃহে রাখলেন।

রামানুজের স্ত্রী জমাম্বার প্রকৃতি ছিল ভিন্ন। একদিন তিনি এক সামান্য কারণে গুরুপত্নীকে কটুভাষায় নিন্দা করে বসলেন। এই কথা শুনে মহাপূর্ণ বললেন, প্রভু যা করেন মঙ্গলের জন্য। বোধ হয় তাঁর ইচ্ছা নয় আমরা আর এখানে থাকি। অনেকদিন শ্রীরঙ্গনাথজীর দর্শন হয়নি। চলো আমরা সেখানে ফিরে যাই। এই বলে তাঁরা পথে বাহির হলেন। রামানুজ তখন কার্যান্তরে কোথায় গিয়েছিলেন। ফিরে এসে গুরু ও গুরুপত্নীর খোঁজ করলেন। সব শুনে রামানুজ মর্মাহত হলেন। তখনই তিনি কর্তব্য স্থির করলেন। স্ত্রীকে বললেন, তোমার বোনের বিয়ে ঠিক হয়েছে। তোমার পিত্রালয়ে যাওয়া উচিত। শুভসংবাদ পেয়ে জমাম্বা তৎক্ষণাৎ রওনা হইলেন। রামানুজ এইবার নিষ্কণ্টক। তৎক্ষণাৎ বরদরাজ মন্দিরে গেলেন। সেখানেই তাঁর সন্ন্যাসদীক্ষা সমাপ্ত হলো। এই সময় শ্রীরঙ্গমের প্রবীণ সন্ন্যাসীরা যোগ্য উত্তরাধিকারের সন্ধানে ছিলেন। রামানুজ সেই পদে অধিষ্ঠিত হলেন।

বৈষ্ণব সাধক গোষ্ঠীপুরম তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য সুখ্যাত ছিলেন।

একসময় রামানুজের তীব্র ইচ্ছা জাগে, তাঁর কাজ থেকে কিছু গুপ্তমন্ত্র লাভ করার। গোষ্ঠীপুরমের কৃপা হয় কিন্তু তিনি স্পষ্টভাবে এই নির্দেশ দেন যে ঐ পবিত্র গুপ্তমন্ত্র যেন যাকে তাকে না দেওয়া হয়। প্রকৃত প্রস্তুতি বিনা এই গুপ্তমন্ত্র লাভের যোগ্যতা জন্মে না।

কিন্তু রামানুজ ছিলেন মানবপ্রেমিক। হেন যোগ্যাযোগ্য বিচার তাঁর ধরলো না। সবাই কেন এ প্রসাদ পাবে না? তাঁর মন সেই শর্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উঠলো এবং মন্ত্রপ্রাপ্তির অল্পক্ষণের মধ্যেই স্থানীয় মন্দিরের প্রাঙ্গণে সমবেত বিপুল জনতাকে উদ্দেশ করে রামানুজ সেই মন্ত্রোচ্চার করলেন, দিলেন সেই মন্ত্র জনগণের কল্যাণে বিলিয়ে একথা শুনে গোষ্ঠীপুরম ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন, তুই যে পাপ করলি তার জন্য তোকে অন্তত নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে!

স্বর্গীয় আনন্দে উদ্ভাসিত হলো রামানুজের মুখমণ্ডল। সহাস্যে বললেন: প্রভু! এতগুলি লোক যদি এই মন্ত্রের দ্বারা উপকৃত হয়, ঈশ্বরানুগ্রহলাভের পথ যদি সুগম হয় আমার এই পাপকর্মের দোষে, তাহলে আমি যুগযুগান্ত নরকে থাকার শাস্তি হাসিমুখে বরণ করলাম!

রামানুজের এই কথা শুনে নিমেষের মধ্যে বৃদ্ধ সাধক শান্ত হলেন। রামানুজকে সস্নেহে আলিঙ্গন করে বললেন: বৎস! আমার ভুল ভাঙলো। ভগবান বিষ্ণুর কৃপা বর্ষিত হোক তোমার উপর আমার বিশ্বাস, তুমি একজন বৈষ্ণব গুরু হবে! এরপর রামানুজের খ্যাতি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই সূত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয়। একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দক্ষিণ ভারতে ধর্মভাবের এক আলোড়ন বয়ে চলেছিল। ভক্তিমার্গের পথপ্রদর্শক হিসাবে রামানুজের মত এক মহান অধ্যাত্মগুরুর আবির্ভাব সে-যুগের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অগাধ পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রে বিস্ময়কর দখল নিয়ে রামানুজ শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধতা করেন। তাঁর ভক্তিভাব তৎকালীন সমাজকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। বিষ্ণুর আরাধনায় মগ্ন হবার উপদেশ

দিয়ে তিনি বললেন : ব্রহ্ম ও মানব এক নয়। সেখানে প্রভেদ আছে। আসলে মানুষ চির দাস, স্রষ্টার সেবক মাত্র! রামানুজের ত্যাগময় জীবন ও সাধনা হাজার হাজার লোককে আকৃষ্ট করেছিল। পবিত্র জীবন যাপনের ও ভগবানের বিশ্বাস স্থাপনের উপদেশ মানুষের মনে নতুন শক্তি এনে দিল।

শাস্ত্রের উপর রামানুজের কয়েকটি টীকা বৈষ্ণবধর্মের ভিৎস্বরূপ। ভক্তিমার্গের উপাসকদের রামানুজের আদর্শ বহু কাল ধরে প্রেরণা দিয়েছে।

রামানুজের যে-কয়জন গুণবান শিষ্য ছিলেন তাঁদের মধ্যে কুরেশ ও দাশরথি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভ্যাসের ব্রহ্মচসূত্রের টীকা লেখার সময় রামানুজ দেখলেন, আচার্য বৌধায়নের টীকায় সাহায্য বিনা এ-কাজ সুসম্পন্ন করা সম্ভব নয়। অথচ সে গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য এবং তার একটিমাত্র পাণ্ডুলিপি কাশ্মীরে আছে। শিষ্য কুরেশকে সঙ্গে নিয়ে তিনি রওনা হলেন। পাণ্ডুলিপির অধিকর্তা সেটি হাতছাড়া করতে চাইলেন না। শোনা যায়, মেধাবী কুরেশ সেই বৃহৎ গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করেন এবং তাঁরই সাহায্যে রামানুজ তাঁর কার্যসিদ্ধ করেন।

গোড়ার দিকে রামানুজের জীবন বিপন্ন হওয়ার একটি ঘটনা লেখা হয়েছে। এভাবে আরও দুইবার তাঁর প্রাণহানির চেষ্টা হয়। তাঁর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় রঙ্গমমঠের প্রধান পুরোহিত ঈর্ষান্বিত হন এবং প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করেন। পরে তা প্রকাশ পায় এবং সেই প্রধান পুরোহিত ও তাঁর শিষ্যবর্গ রামানুজের প্রতি অনুগত হন।

চোলরাজ্যের অধিপতি দ্বিতীয় রাজেন্দ্র ছিলেন শৈব এবং তিনি তাঁর গোঁড়া সভাসদদের প্ররোচনায় স্থির করেন রামানুজকে সরিয়ে ফেলতে হবে। তাঁর সভায় তাঁকে ডেকে পাঠান, কিন্তু এবার শ্রীরঙ্গমের সন্ন্যাসীরাই রামানুজকে সাবধান করে দেন। এমনকি তাঁরা তাঁকে ছদ্মবেশে মহীশূরে চলে যেতে বাধ্য করেন। শিষ্য কুরেশ

রামানুজ সেজে চোলরাজের দরবারে উপস্থিত হন। কিন্তু কুরেশের আসল পরিচয় প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় ক্রুদ্ধ চোলরাজ শাস্তিস্বরূপ তাঁর চোখদুটি উপড়ে ফেলেন। কুরেশের গুরুভক্তি ও গুরুর জীবনরক্ষার জন্য এমন নির্যাতন স্বীকার সকলকে বিস্ময়াভিভূত করে। শোনা যায়, গুরু রামানুজের দৈবশক্তিবলে কুরেশ তাঁর দৃষ্টি শক্তি ফিরে পান।

রামানুজ প্রবর্তিত দর্শন 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' নামে পরিচিত। একশো কুড়িবছর বয়সে ১১৩৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের এই মহান সাধক দেহরক্ষা করেন।

খাজা মৈনুদ্দিন চিস্‌তি

খাজা মৈন-উদ্-দীন্ চিস্তি মুসলমান সাধকমণ্ডলীর এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তিনি জন্মগ্রহণ করেন খোরাসনের চিস্তি নামক স্থানে, এগারোশ' বিয়াল্লিশ খৃষ্টাব্দে। বয়সকালে তিনি জন্মভূমি ত্যাগ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন ভারতবর্ষে আজমীর শহরে খাজা সাহেব স্বীয় প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমান রাজশক্তির মুখাপেক্ষী ছিলেন না। স্বীয় সততা, শুদ্ধি আর ভগবদ্‌ভক্তির দ্বারা তিনি নানা জাতের নানা ধর্মের লোককে আকৃষ্ট করেন। তিনি যখন আজমীরে এলেন তখন পৃথ্বীরাজ সেখানকার রাজা। শোনা যায় পৃথ্বীরাজ তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন।

খাজা সাহেবের পিতার নাম সৈয়দ ঘিয়াস-উন্-দীন্ হাসান। মাতার নাম মাহরুন। হাসান দরিদ্র হলেও সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন স্বীয় ধর্মপরায়ণতা আর ঈশ্বর বিশ্বাসের গুণে। প্রিয় পুত্র মৈন-উদ্-দীনকে তিনি বিশেষ যত্নে লালন-পালন করেন। বংশগৌরব ছিল তার প্রধান অনুপ্রেরণা। দুর্ভাগ্যবশতঃ মাত্র পনরো বছর বয়সে মৈন-উদ্-দীন পিতৃমাতৃহারা হন। এহেন শোকতাপ সত্ত্বেও বালক মৈন-উদ্-দীন বীরের মত জীবন-সংগ্রামের সম্মুখীন হন। কিছুকালের মধ্যেই তিনি বিখ্যাত মুসলমান দরবেশ ইব্রাহিম কান্দোজীর সংস্পর্শে আসেন। এই দরবেশ তাঁহাকে আধ্যাত্মিক চিন্তায় অনুপ্রাণিত করেন এবং ঈশ্বরানুভূতির পথে চালিত করেন।

সেকালে সমরকন্দ্ ছিল শিক্ষাসংস্কৃতির কেন্দ্র। সেখানে বহুকাল কোরান ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থচর্চায় অতিবাহিত করে মৈন-উদ্-দীন রওনা হলেন ইরাকের পথে। সেখানে দেখা হলো আর এক মহান সাধক

ওসমান হারুনীর সঙ্গে। এই যোগাযোগ তাঁর জীবনের একটি প্রধান ঘটনা, কারণ সাধক ওসমানের সংস্পর্শ তাঁকে নতুন সাধনার পথে চালিত করে। দীর্ঘ পাঁচ বছর এই সাধকের নির্দেশিত পথে সাধন-ভজন করে মৈন-উদ্‌-দীন যেন তাঁর বহুবাঞ্ছিত সাফল্য লাভ করলেন। একদিন গুরু ওসমান হারুনী তাঁকে ডেকে বললেন: বৎস! আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হয়েছেন। তুমি এবার বিভিন্ন তীর্থদর্শনে যাও, সেখানকার সাধুপুরুষদের সঙ্গলাভ করো। তাঁদের সংস্পর্শে এলে তুমি আরও এগিয়ে যাবে তোমার সাধনপথে।

গুরুর আদেশে মৈন-উদ্‌-দীন বাগদাদ গেলেন। সেখানে অনেক উচ্চমার্গের সাধকের বাস। ধর্ম ও অধ্যাত্ম আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন অনেক সুফি, অনেক দরবেশ, আর তাঁদের সেই আলোচনায় যোগ দেন মৈন-উদ্‌-দীন। অল্প সময়ের মধ্যেই মৈন-উদ্‌-দীনের অধ্যাত্ম-উপলব্ধির পরিচয় তাঁরা পেলেন এবং তাঁকে মহান সাধক বলে স্বীকৃতি দিলেন। কুতবুদ্দিন কাকি নামক এক প্রখ্যাত দরবেশ মৈন-উদ্‌-দীনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। এই কুতবুদ্দিন পরে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন এবং দিল্লীর সুলতান কুতবুদ্দিন ও আলতুতমিসের ধর্মগুরু হন।

বাগদাদ থেকে মৈন-উদ-দীন চলে যান তাব্‌রিজ, ইস্পাহান ও অন্যান্য তীর্থে। এই যাত্রায় তিনি শেখ আর সৈয়দ, শেখ নাসিরুদ্দিন এবং হজরৎ আবদুল কাদার জিলানি প্রমুখ প্রথিতযশা ধর্মগুরুর সংস্পর্শে আসেন।

হজরত আবদুল কাদার জিলানি সমকালীন ইসলাম-ধর্মজগতে এক সর্বজনশ্রদ্ধেয় নাম। তাঁকে বলা হতো ঘাউস-ই-আজম। ভারতবর্ষে বড়া পীরসাহেব নামে পরিচিত ছিলেন তিনি। হজরত জিলানি মৈন-উদ্‌-দীনের মধ্যে দেখতে পান এক উন্নতমান সাধককে। তাঁর আশীর্বাদ বর্ষিত হয় এবং তার ফলে মৈন-উদ্‌-দীন কিছুদিনের মধ্যেই সমগ্র মধ্য প্রাচ্যে এক উচ্চমার্গের সাধকরূপে স্বীকৃতি পান।

এর পর মৈন-উদ্-দীন চলে আসেন ভারতে। প্রথমে লাহোরে, তারপর দিল্লীতে, তার কিছু পর আজমীরে। দিল্লীতে তিনি রেখে এলেন শিষ্য কুতবুদ্দিন কাকিকে। আজমীরে গড়ে উঠলো এক বিরাট ইসলামধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্র।

একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার মাধ্যমে খাজা মৈন-উদ্-দীনের আশ্চর্য ঐশী ক্ষমতার কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রীষ্মের এক উষ্ণ মধ্যাহ্নে ক্লান্ত মৈন-উদ্-দীন আজমীরের প্রান্তস্থিত এক ছায়া নিবিড় গাছের তলায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আজমীর রাজের কয়েকজন কর্মচারী একদল উট নিয়ে সেখানে বসেছিল। হঠাৎ সেই কর্মচারীরা মৈন-উদ্-দীনের কাছে এসে ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠলো, ওহে ফকির! রাজার উটের চারণের জায়গা এটা! তোমার এখানে বসার অধিকার নেই! সরে পড়ো দেখি!

কর্মচারীদের চোখ রাঙানি দেখে খাজাসাহেব কোনরকম প্রতিবাদ না করে ধীরে ধীরে উঠে অন্যত্র চলে গেলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই এক অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে গেল। সব কটা উট তাদের চলার শক্তি হারিয়ে ফেললো। পায়ে যেন পক্ষাঘাত হয়েছে। কর্মচারীরা হতভম্ব হয়ে রইলো। ছুটলো তারা রাজদরবারে। সব কিছু শুনে তারা সন্দেহ করলো, নিশ্চয় এই আকস্মিক দুর্ঘটনার সঙ্গে ফকির সাহেবের যোগ রয়েছে! দরবেশ রুষ্ট হয়েছেন, তাই এই সাজা।

পৃথ্বীরাজের কানে খবরটা গেল। তিনি আদেশ দিলেন, সেই দরবেশকে খুঁজে বার করা হোক এবং কর্মচারীদের আচরণের জন্য ক্ষমা চাওয়া হোক্। অবশেষে খাজা সাহেবের সন্ধান পেলো তারা। খাজা সাহেব তাদের ক্ষমা করলেন এবং বললেন : যাও। উটদের রোগমুক্ত করলাম আমি। কিন্তু মনে রেখো, দরবেশ আর সাধু-সন্তদের শান্তি ক্ষুণ্ণ করো না কখনো।

এই ঘটনার পর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো খাজা সাহেবের নাম সমস্যা জর্জরিত মানুষের দল আশা, আশ্বাস, শান্তি, সান্ত্বনার জন্য যেতে

লাগলো তাঁর কাছে। ধনী দরিদ্র, সাধারণ মানুষ থেকে রাজ-রাজড়া সুলতান বাদশা, সকলেই এই মহান সাধকের নামে শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ালো। খাজা সাহেবের সাধনক্ষেত্র ছিল পুষ্কর আর সাবিত্রী পাহাড়ের নিকটবর্তী আজমীর শরিফে। হিন্দু ও মুসলমানের অধ্যাত্মসাধনা কত শান্তিপূর্ণভাবে চালিত হতো এই দুই ভিন্নধর্মীদের একই তীর্থক্ষেত্রে।

সাধারণ মানুষের জন্য প্রেম আর করুণাই ছিল হজরত মৈন-উদ্-দীনের প্রধান গুণ। সারাজীবন তিনি সেই প্রেম করুণা বিলিয়ে গেছেন। তাদের দুঃখে, তাদের দুর্দশায় প্রাণ কেঁদেছে তাঁর, তিনি চেষ্টা করেছেন তাদের দুঃখ দুর্দশা দূর করতে, তাদের শান্তি দিতে। হাজার হাজার অনুরাগী শিষ্য তাঁর কাছে আসতো, বহু অর্থ সংগৃহীত হতো কিন্তু খাজা সাহেব তার প্রায় সবই দান করে দিতেন দরিদ্রদের। নমাজ শেষে তিনি সব মুদ্রা বিলিয়ে দিতেন সমাগত সাধারণ মানুষের কাছে। আজমীর শরিফের লঙ্গরখানা এক বিস্ময়কর প্রতিষ্ঠানরূপে পরিচিত হয়ে ওঠে।

এই মহান সাধকের অমর বাণী এখনও অধ্যাত্ম জগতের সম্পদ। তিনি বলতেন: আল্লাহ্-র করুণা লাভ করতে হলে সমুদ্রের মত মহানুভব, সূর্যের মত দয়ালু আর বসুন্ধরার মত সেবাপরায়ণ হতে হবে! আল্লাহ্-র প্রকৃত প্রেমিক সে-ই, যার মধ্যে স্বর্গ সুখ স্পৃহা নেই আবার পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মোহ নেই।

বিদেশাগত এই সাধক ভারতকে ভালোবেসেছিলেন, ভারতকে করেছিলেন তাঁর সাধনার ক্ষেত্র। সত্তর বৎসর বয়সে তিনি মরদেহ ত্যাগ করেন। তাঁর মজহর অর্থাৎ সমাধিক্ষেত্র আজও লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীর তীর্থক্ষেত্র।

মহাত্মা কবীর

শীতের রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে আসছে। চারিদিকে ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন। আচার্য রামানন্দ কাশীর অসিঘাটে গঙ্গাস্নান করতে এসেছেন। ব্রাহ্মমুহূর্তের বেশী দেরি নেই, তাড়াতাড়ি আশ্রমে ফিরে তাঁকে কৃত্যাদি শেষ করতে হবে।

পথঘাট একেবারে জনশূন্য, নীরব নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে শুধু শোনা যাচ্ছে প্রত্যুষচারী পাখির ডানা ঝাপটানি, আর গঙ্গার জল স্রোতের ছলছলাৎ শব্দ।

অস্ফুট আলোকে ঘাটের সিঁড়িটি তেমন ভাল দেখা যায় না। অবশ্য রামানন্দের তাতে অসুবিধার কিছু নেই, এখানে ওঠা নামা করায় তিনি অভ্যস্ত।

কমণ্ডলু ও বহির্বাস ঘাটের ওপর রেখে রামানন্দ কেবল নীচের সিঁড়িতে পা বাড়িয়েছেন, হঠাৎ এই সময় তিনি যেন কি মাড়িয়ে ফেললেন।

ছি-ছি, একি কোন মৃতদেহ ? রাম, রাম, রাম। নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করলেন, কে হে শীতের রাতে এমন করে ঘাটের সিঁড়িতে শুয়ে ? দাঁড়াও ত' বাবা। তুমি কে ?

শায়িত মানুষটি ত্রস্তব্যস্তে ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। শ্রদ্ধানত শিরে যুক্তকরে সে নিবেদন করলো : প্রভু! আমি কবীর-দাস, আপনার অনুগৃহীত শিষ্য।

সে কি কথা! এ আবার কি বলছো ? তোমায় ত' বাবা আমি কখনো শিষ্যরূপে গ্রহণ করিনি।

প্রভু! আমায় স্পর্শ করে এই যে রামমন্ত্র উচ্চারণ করলেন এখনই আমার দীক্ষা হলো। আপনিই আমার গুরু! আজ এ

দেহে পবিত্র পাদস্পর্শ দিয়ে যে নাম দীক্ষা আপনি দিলেন, তাই হবে আমার মুক্তিপথের পাথেয়। এ অধমকে আপনি আশ্রয় দিন আর আশীর্বাদ করুন প্রভু!

ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম নিবেদন করে কবীরদাস গঙ্গার ঘাট থেকে চলে গেলেন। অপসৃয়মান তরুণের দিকে রামানন্দ নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে রইলেন। অন্তরপটে সেদিন তাঁর নবলব্ধ শিষ্যের কোন ভবিষ্যৎ চিত্রটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল কে জানে!

দীর্ঘদিন অধ্যাত্মচিন্তায় দিন কাটিয়েছেন কবীর। মনের প্রবল বাসনা কোনো এক মহাত্মার কাছে দীক্ষা নেন। বেনারসের বহু সাধক সন্ন্যাসীর কৃপা প্রার্থনা করেছেন, কিন্তু দরিদ্র মুসলমান তাঁতীর সন্তান বলে বঞ্চিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন বার বার। কবীর জানতেন, স্বামী রামানন্দ অগণিত ভক্তকে আশ্রয় দিয়েছেন, তাঁর কাছে জাতিবিচার ছিল না, সকলের জন্য তিনি ভক্তিমার্গের তোরণ উন্মুক্ত রাখতেন।

আচার্য রামানন্দের ভক্তিধারা বেয়ে অধ্যত্ম ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন বহুতর সার্থক সাধক। মুসলমান জোলা কবীরদাস, চর্মকার রুইদাস, জাঠ জাতীয় ভক্ত ধনা ও ক্ষৌরকার সেনা এঁদের অন্যতম। কিন্তু কবীরদাসই আচার্য রামানন্দের উদার প্রাণময় ধর্মমতকে উত্তর ভারতের দিগ্‌বিদিকে ছড়িয়ে দেন। এ সম্পর্কে হিন্দীতে একটি সুপ্রচলিত দোঁহা আছে:

ভক্তি দ্রাবিড় উপজি
লায়ে রামানন্দ,
প্রগট কিয়া কবীরনে
সপ্তদ্বীপ নও খণ্ড।

অর্থাৎ ভক্তি উপজিত হয় দ্রাবিড় দেশে, তা আনয়ন করেন রামানন্দ, আর কবীর তা বিস্তারিত করেন সারা পৃথিবীতে।

কবীর জন্মগ্রহণ করেন ১৩১৮ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমান তাঁতীর ঘরে, বেনারসে। পিতা নীরু জোলা ও মাতা নীমা ছিলেন ঈশ্বরভীরু সৎ দম্পতি। এঁদের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও নাথযোগীদের আচার আচরণ তাঁদের মধ্যে প্রকাশ পেতো। সুফী সম্প্রদায়ের সাধকদের সঙ্গে তাঁরা যেমন মিশতেন, হিন্দু মহাপুরুষদের সাহচর্যও তাঁরা তেমনি কামনা করতেন। নিরক্ষর অর্থসংস্থানহীন এই পরিবারকে প্রধানতঃ নির্ভর করতে হতো বস্ত্র বয়নের ওপর। বাপ-মার ইচ্ছা, কবীর তাঁদের বৃত্তি গ্রহণ করুক, এ কাজে দক্ষ হোক। সে সংসারের কিছুটা ভার নিলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তাঁরা বাঁচেন।

কিন্তু কবীরকে নিয়ে পেরে ওঠা দায়। সংসারের কোন কাজেই তার মন নেই। কোথায় কে ফকীর এসেছেন বা সাধুসন্ন্যাসী এসেছেন, কবীর পাগলের মত তাঁদের পিছু পিছু ঘোরে। ঘরছাড়া বৈরাগীর মত মন তার। বৃদ্ধ পিতামাতা শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাঁতঘরে গিয়ে যদি বা বসেন কবীর, হাতের মাকু হাতেই থেকে যায়, টানাপোড়েনের সূতা ছিঁড়ে বয়ন পণ্ড হয়ে যায়। হাল ছেড়ে দিয়ে কবীর গেয়ে ওঠেন—

দিন দয়াল ভরোসে তেরে।
সভ পরবারু চড়াইয়া বেড়ে।

অর্থাৎ হে আমার দীনদয়াল! তোমার ওপরই যে ভরসা। আমার সারা পরিবারকে তোমার নৌকায় চড়িয়ে দিলাম প্রভু।

শরণাগতি ও আত্মসমর্পণের মধ্যে ভক্ত কবীরের সাধনা দিনের পর দিন এগিয়ে চলে।

মুসি মুসি রোয়ৈ
কবীর কা মায়,
এই বারক কৈসে
জীয়হি রঘুরায়।

তন্‌না বুন্‌না সব ত্যজ্যো
হৈ কবীর
হরিকা নাম লিখি
নিয়ো শরীর।

অর্থাৎ, দুঃখভরে রোদন করতে থাকে কবীরের মা—হে রঘুরায়! এবার কি করে জীবন রক্ষা হবে, তা বল। কবীর তার সারা শরীরে লিখে রেখেছে হরির নাম, আর তানা-বোনা সব কিছু কাজ সে করেছে পরিত্যাগ।

শক্তিমান আচার্য রামানন্দের স্পর্শে কবীর হয়ে গেছেন এক নতুন মানুষে রূপান্তরিত। নামের নেশায় তিনি বুঁদ হয়ে গেছেন, লোকে তাঁকে ভাবে উন্মাদ। নামরসে নিরন্তর অবগাহনের ফলে যে অবস্থা দেখা দেয় স্বরচিত "দোঁহা'য় কবীর তা সুন্দর প্রকাশ করেছেন:

কহ কবীর গুঁগে গুড় খায়া
বিন রসনা কা কয়ে বড়াঈ?

বোবা খেয়েছে গুড়, রসনা নামের মহিমা বর্ণনা করবে কি করে?

কবীরের সাধনা ছিল নিগূঢ় প্রেমের সাধনা। তিনি বলেছেন: রাগ লখৈ সো তরিয়াঁ। অর্থাৎ প্রেমকে যে ভাগ্যবান দর্শন করেছে, মুক্তি মিলেছে তারই।

মিথ্যা অনুষ্ঠান আর কুসংস্কার ছিল তাঁর দুচক্ষের বিষ। এর ওপর কঠিন আঘাত হেনেছিলেন কবীর। এই ব্যাপারে তিনি কাউকেই ছেড়ে কথা বলেন নি, তা সে মোল্লাই হোক, সাধুসন্তই হোক। ব্রাহ্মণদের বিদ্রূপ করে তিনি দোঁহায় গেঁয়েছেন:

মালা ফেরত জনম গয়া, গয়া ন মন্‌কা ফের।
কর্‌কা মালা ছোড়কে মনকা মালা ফের॥

বহুদিন ধরে জপমালা গুণছো। শেষ দিন এসে গেল: তবু মনের কোনো পরিবর্তন হয়নি তোমার। আর কেন? এবার ঐ মালা ঘোরানো ছেড়ে দিয়ে মনের মালার সুতো ঘোরাও!

ভক্ত সাধু বা অসার্থক যোগীকে উদ্দেশ করে তিনি গাইলেন :

মন না রগাঁয়ে
রগাঁয়ে যোগী কাপড়া।
আসন মাড়ি মন্দিরমে বৈঠে,
ব্রহ্ম ছাড়ি পূজন লাগে পথরা।

অর্থাৎ ওরে যোগী, মন না রাঙিয়ে রাঙালি তুই কাপড়। আসন করে বসলি এসে মন্দিরে,—সেখানে তুই পুজো করলি পাথর!

আবার, একই তীক্ষ্ণ তির্যক ভাষায় তিনি মোল্লাকে বললেন: 'জানিনা তোমার আল্লা দেখতে কেমন। তুমি আজান করো শুনি। কিন্তু তোমার ঈশ্বর কি বধির? তুমি কি জানো না, সামান্য একটা পতঙ্গের ছন্দোময় নৃত্যধ্বনি ক্ষীণতম হলেও ভগবানের কানে তা পৌঁছয়।

গোঁড়া হিন্দু আর মুসলমানরা কবীরের প্রতি ক্রুদ্ধ হন। প্রচলিত সামাজিক অনুশাসনের প্রতি তিনি যে তাচ্ছিল্য ও বিরোধিতা প্রকাশ করে যাচ্ছিলেন সমাজ নেতারা তাতে উত্তেজিত হন। বাদশাহ ইব্রাহিম লোদীর কাছে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ পৌঁছয়।

বাদশাহ সেবার রাজকার্যে জৌনপুরে এসেছেন। এসময় তাঁর দরবারে কবীরদাসের ডাক পড়লো।

সুলতান কবীরকে ডেকে এনে প্রশ্ন করেন, মুসলমান হয়ে কেন তিনি মোল্লাদের ও ইসলাম ধর্মের অনুষ্ঠানাদির বিরুদ্ধাচারণ করেন। উত্তরে শান্ত ও সংযত কণ্ঠে তিনি নিবেদন করলেন: হুজুর, আমি হিন্দুও নই, মুসলমানও নই। আমি সেই দেশের লোক যে-দেশে মানুষে-মানুষে সীমানা নেই, যেখানে অনন্ত আলো আর ঈশ্বরের আশীর্বাদ বিরাজিত।

কবীরের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর সুলতান লোদী বুঝলেন, কবীর একজন ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা মহাপুরুষ। সম্প্রদায়গত ধর্মের অনেক ওপরে তিনি। মহাত্মাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে সুলতান চলে গেলেন।

কবীরের প্রচারিত বাণীর মূল বক্তব্য ছিল,—ভক্তি, পবিত্রতা সাধনা ও পার্থিব সুখবিতৃষ্ণা। আনুষ্ঠানিক ধর্মাড়ম্বরের প্রতি তাঁর ঘৃণা সাধারণের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল এবং তাদের সংস্কারমুক্ত করেছিল।

কাশীর গোঁড়া মুসলমান ও রাজপ্রতিনিধিরা কবীরের সংস্কারপন্থী ধর্মমতকে কোনদিনই সুনজরে দেখতেন না। এঁদের আক্রোশ ও বিরোধিতায় কবীর উত্ত্যক্ত হয়ে ওঠেন। তার ওপর অগণিত ভক্ত দর্শনার্থীর ভিড়। কবীর ছিলেন নির্জনতাপ্রয়াসী। তাই তিনি বেনারস ত্যাগ করে চলে যান। প্রথমে ফতেপুর জেলায় গঙ্গাতীরস্থ মাণিকপুরে তিনি সাধনভজন করতে থাকেন। সেখানে কিছুকাল অবস্থান করার পর তিনি যান এলাহাবাদের অপর তীরে ঝুঁসির চড়ায়। এইখানে সুফী সিদ্ধ ফকির তক্কী সাহেবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে এবং তাঁর কাছে নানা নিগূঢ় সাধন লাভ করে উপকৃত হন। এরপর গোরখপুর জেলার মগহর নামক এক অখ্যাত স্থানে নির্জন অমী নদীতীরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন। ভক্ত ও অনুরাগীর দল তাঁকে পবিত্রভূমি কাশীতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে ব্যাকুল, এ দেহ যদি ত্যাগ করতেই হয় তাহলে কাশী ছেড়ে মগহর যাওয়া কেন? কবীর স্মিতহাস্যে বলেন :

জস্ কাশী তস্ মগহর্ উষর
হিরদৈ রাম সতি হোঈরে।

অর্থাৎ, কাশী আর মগহর্ দুই-ই উষর। পরম সত্য বস্তু হচ্ছেন হৃদয়স্থিত রাম।

সেই মগহর্-এর ছোট্ট মাটির কুটিরে কবীর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কবীরদাসের দেহের সৎকার সম্বন্ধে এক কিম্বদন্তি শোনা যায়। তাঁর ভক্তদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই সংখ্যা ছিল অগণিত। হিন্দুরা এ-দেহের অগ্নিসংস্কার করতে চান। কিন্তু মুসলমানেরা সম্মত

হন কবর দিতে। এই আসন্ন সংঘাতের মুখে সিদ্ধপুরুষ কবীরদাসের অলৌকিক বাণী শোনা যায়। শুভ্র বস্ত্রখণ্ডে মৃতদেহটি ঢাকা ছিল। প্রত্যাদেশ অনুযায়ী আচ্ছাদন খুলে দেখা গেল, দেহটি নেই, পড়ে আছে একরাশ পদ্মফুল। কথিত আছে, হিন্দুরা কিছু সংখ্যক ফুল কাশীতে নিয়ে যান এবং এগুলি সেখানে যথারীতি সৎকার করেন। আজও কাশীর কবীর চৌরায় তাঁর স্মৃতিমন্দির দণ্ডায়মান। মুসলমান ভক্তেরা অবশিষ্ট ফুলগুলির মগহর-এ কবরস্থ করেন। মগহর্-এর সমাধিমন্দিরে আজও শত শত দর্শনার্থী ভিড় করে।

গুরু নানক

পিতার নাম কালু বেদী, মাতার নাম তৃপ্তা। নানক এঁদের একমাত্র পুত্র। জন্ম তালওয়ান্দি গ্রামে, ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে।

তালওয়ান্দির পরবর্তীকালে নামকরণ করা হয় নানকানা। নানকের স্মৃতি বুকে ধরিয়া আছে এই গ্রাম—ভক্ত শিখেরা তাই উত্তরকালের এই তীর্থকে ঐ নামে চিহ্নিত করেন। এখন এটি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। লাহোর থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে গুজরানওয়ালা জেলার এক প্রান্তের এই গ্রামটি তখন ছিল প্রকৃতির লীলা-নিকেতন। অদূরে প্রসারিত অরণ্যময় বার-মালভূমি, তারও ওপাশে বিস্তীর্ণ মরু-অঞ্চল। বৈশাখের ঝড়-তাণ্ডবের শেষে বনভূমিতে জেগে ওঠে হরিৎ শোভার অপরূপ মাধুর্য। বালক নানক মনের আনন্দে খেলে বেড়ায় বনে-জঙ্গলে, পথে-প্রান্তরে। মুখে চোখে ভাব তন্ময়তা, মুখে সদাই লেগে থাকে স্বরচিত ভজনগান। লেখাপড়ায় মন নেই, বালক সংসার-বিরাগী। বাবা-মা দু'জনেই হতাশ হয়ে পড়েন ছেলের এই ব্যবহারে। ক্ষেতখামার সামান্য কিছু আছে কিন্তু তাতে সংসার চলে কই? বাধ্য হয়ে কালু বেদীকে নিতে হয় জমিদার সেরেস্তায় হিসাব-নিকাশের কাজ।

চাকুরী করে কিছু পয়সা-কড়ি জমলো। কালু বেদী ঘটা করে ছেলের উপনয়নের আয়োজন করলেন। কিন্তু সেই উৎসব-অনুষ্ঠানে বালক নানককে নিয়ে কি কম ঝামেলা? পুরোহিতের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেয় নানক। শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে কি হবে? গলায় পৈতে ঝুলিয়ে কি অমরলোকে পৌঁছনো যায়? সুতোর মালার চেয়ে ঈশ্বরের নামের মালাই কি কল্যাণকর নয়? পুত্রের ঔদ্ধত্যে কালু বেদীর মাথা হেঁট হয়ে যায়।

কলু বেদীর প্রভু জমিদার রায় বুলার কিন্তু বড় ভালোবাসেন এই ছেলেটিকে। কি আকর্ষণ তার ভাববিহ্বল দুটি চোখে। বনের পাখির মত কি মনমাতানো গান।

কালু বেদীকে ডেকে তিনি মৃদু তিরস্কার করেন। বলেন, এ ছেলে তোমার সাধারণ নয়। তার চোখে মুখে আমি দেখেছি পরমভক্ত সাধুর ছায়া। তার ভজনগানে আমি শুনেছি মুক্তির ব্যাকুলতা। নিশ্চয় ও এক সর্বজনমান্য ধর্মনেতা হবে!

রায় বুলার ছিলেন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, মুসলমান, কিন্তু সজ্জন ও ধর্মনিষ্ঠ। তাঁর সেদিনকার সেই ভবিষ্যদ্বাণী উত্তরকালে সফল হয়ে ওঠে। ভারতের এক শক্তিমান মহাপুরুষ ও ধর্মপ্রবর্তকরূপে গুরু নানকের অভ্যুদয় দেখা দেয়। এক উদার ও সর্বজনীন ধর্মবোধের ভিত্তিতে নানক প্রবর্তন করেন তাঁর শিখধর্ম। আপন ভাগবত জীবনের সাধনা ও সিদ্ধির মধ্য দিয়ে ভগবদ্ ভক্তির যে নূতন ভাবতরঙ্গ তিনি তোলেন তা সারা পাঞ্জাবে ও উত্তর ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

তখন সম্রাট বহলুল লোদীর রাজত্বকাল। উত্তর-পশ্চিম ভারতের বড় দুর্দিন। ধর্মান্ধতা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতে মানুষের জীবন বিপর্যস্ত। কারো মনে কোন স্বস্তি নেই। লোদী সম্রাট ও পাঠান আমীর অমরাহদের ধর্মীয় গোঁড়ামি ও শাসনগত দুর্বলতায় অবস্থা জটিল হয়ে পড়েছে। এই পটভূমিতেই নানকের অভ্যুদয়।

সরকারী রাজস্ব বিভাগের তরুণ আমীন জয়রামের সঙ্গে নানকের ভগ্নী নানকীর বিবাহ হয়ে গেল। এর পর ঘরে একটি বধূ না এলে কি করে চলে? তৃপ্তার বয়স হয়েছে, খেটে খেটে আর পারেন না। অতএব নানকের বিয়ের কথা উঠলো। কোন ওজর-আপত্তি টিকলো না। গুরুদাসপুর জেলার বাতালা গ্রাম থেকে এক সম্বন্ধ এলো। সুন্দরী সৎস্বভাবা পাত্রী, নাম সুলখনী। এক শুভলগ্নে বিবাহ অনুষ্ঠিত হল।

কিন্তু বিয়ে দিয়েও মতিগতি ফেরানো গেল না ছেলের। সেই একই রকম ভাব তার। সংসারের দিকে কোন নজর নেই। জমিদার রায় বুলার বললেন, কালু! তোমার ছেলেকে ফার্সি পড়াও। জামাই জয়রাম সদরে রয়েছে, সেখানে একটা চাকরি হয়ে যাবে। তাছাড়া আমিও চেষ্টা করবো।

সেইমত ফার্সি শিক্ষক মৌলভী রুকন-উল-উদ্দীনের কাছে নানককে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। ছাত্রের মেধা ও প্রতিভা দেখে মৌলভী বিস্মিত হন, আবার বিরক্তও হন তার ওপর, কারণ ফার্সি শিক্ষার প্রচলিতরীতি ও পন্থা সে মেনে চলতে চায় না। বিদ্যায়তনের ছাঁচে তৈরী হয়ে ওঠবার পাত্র নন নানক। হঠাৎ একদিন ফার্সি শেখা ছেড়ে দিলেন। ছেলের এই আচরণে রেগে গিয়ে কালু বেদী তাকে ক্ষেতে মোষ চরাবার কাজে নিযুক্ত করলেন।

এই সময় এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটে গেল। মোষগুলো ছেড়ে দিয়ে ক্লান্ত নানক বটগাছের ছায়ায় নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোচ্ছিলেন। হঠাৎ একজনের চিৎকারে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। চোখ চেয়ে দেখেন গ্রামের গৃহস্থ ভট্টি তাকে গালি পাড়ছে এবং অনেকে জড় হয় গেছে। তার অভিযোগ, নানকের মহিষেরা তার ক্ষেতের শস্য নির্মূল করে খেয়েছে ও সব তছনছ করেছে।

নানক দোষ স্বীকার করে করজোড়ে ক্ষমা চাইলেন কিন্তু ভট্টি নাছোড়বান্দা। একেবারে জমিদার রায় বুলারকে টেনে আনলো অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য। তদন্তে এসে ভট্টি ও রায়-বুলার একেবারে হতবাক্। ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে দুইজনেই বিস্মিত, মহিষের অত্যাচারের কোন চিহ্ন নেই, এক ছড়া শস্যও নষ্ট হয়নি। ভট্টি একেবারে অপ্রস্তুত! রায়-বুলারের প্রতীতি হলো, নানক শুধু ঈশ্বরভক্তই নয়, ঈশ্বরাশ্রিতও বটে।

ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে কালু বেদী অস্থির। একদিন তিনি গোটা কুড়ি টাকা দিলেন নানকের হাতে। বললেন, কিছু একটা কর

ঐ তো রয়েছে চুহারকানার মস্ত বাজার। ওখানে দোকান খোল এই টাকা দিয়ে।

ছেলে বাবার প্রস্তাবে সম্মত হলো। টাকা নিয়ে বাড়ির বিশ্বস্ত ভৃত্য বালার সঙ্গে রওনা হলো।

কয়েক মাইল যাওয়ার পর কয়েকজন নাগা সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তাদের দেখা। সাধুমাত্রেই নানকের কাছে সম্ভ্রম ও বিস্ময়ের বস্তু। তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে করতে নানকের বড় বাসনা হলো তাঁদের সেবা করার। অমনি সে সেই কুড়ি টাকা খরচ করে বসলো সন্ন্যাসীদের সেবায়। ভৃত্য বালার কোন মানাই খাটলো না। উল্টে নানক যুক্তি দেখালে, সাধুদের আশীর্বাদই কি সব চাইতে ভালো সওদা নয়? দেখছো না, ভগবানের কৃপায় এক মস্ত লাভজনক ব্যবসার সুযোগ আমি পেলাম।

এহেন লাভজনক ব্যবসা সেরে নানক ঘরে ফেরামাত্র কালু বেদী ক্রোধোন্মত্ত হলেন। রায় বুলার অবশ্য এই কাহিনী শুনে মুগ্ধ হলেন এবং কালুকে ক্রোধ সংবরণ করতে আদেশ দিলেন। এমন কি কুড়িটা টাকাও দিলেন তাঁকে।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যে আবার অনুরূপ এক কাণ্ড করে বসলেন। গ্রামের উপকণ্ঠে এক সাধুবেশী ভবঘুরে এসে সাহায্য চাইলে পর নানক তাকে বিয়ের সোনার আংটি ও একটা পিতলের লোটা অবলীলায় দিয়ে দিলেন। কালু বেদীর পক্ষে আর ধৈর্য ধরা সম্ভব হলো না। পরিষ্কার ভাষায় ছেলেকে বলে দিলেন, তুমি বাপু বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে বাস করো।

এ-সঙ্কটেও রায়-বুলার এগিয়ে এলেন। স্থির হলো সুলতানপুরে ভগ্নীপতির কাছে গিয়ে নানক থাকুক।

সুলখনী খুব কান্নাকাটি করলেন। কত অনুনয় বিনয় তাঁর, তুমি আমায় ছেড়ে যেয়ো না। কিন্তু নানক তাকে অনেক বুঝিয়ে চলে গেলেন বোনের বাড়ি।

ছোট ভাইকে নানকী বড় স্নেহ করতেন। নানককে কাছে পেয়ে তিনি বড় খুশী। শ্যালকের চাকুরীর জন্য জয়রাম নবাব দৌলতখানের কাছে আবেদন জানালেন। নানক ফার্সি জানে, অতএব সঙ্গে সঙ্গে সরকারী সরবরাহ বিভাগের গুদামে চাকুরী জুটে গেল। অল্পদিনের মধ্যে নানক তাঁর মিষ্ট স্বভাব ও কর্মশক্তির গুণে কর্মকর্তাদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন।

ভগ্নী নানকীর সংসার খুব সচ্ছল, তাই নানককে তাঁর উপার্জিত টাকার একটিও ব্যয় করতে হয় না। প্রায় সব অর্থই তিনি লাগান সাধুসেবা, দানধ্যান ও সৎকর্মে। ব্যবহারিক জীবন ও বহিরঙ্গ কাজের অন্তরালে বয়ে চলে নানকের নাম-সাধনা আর ভক্তিরসের ধারা।

সাধুসেবার এই উৎসাহ দুহ'বার নানকের বিপদ টেনে আনে। কয়েকটি কর্মচারী ঈর্ষাবশে নানকের বিরুদ্ধে নবাবের কাছে তছরূপের অভিযোগ আনে। সন্দিহান হয়ে নবাব তদন্তের আদেশ দেন। দুবারই প্রমাণিত হয় নানক অসাধু নন।

অতঃপর নানক স্ত্রী সুলখনীকে কর্মস্থলে নিয়ে আসেন কয়েক বৎসরের মধ্যে দুইটি পুত্রও জন্মলাভ করে। একটির নাম শ্রীচাঁদ, অপরটি লক্ষ্মীচাঁদ।

সুলতানপুরে নানককে ঘিরিয়া একটি ভক্তগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। নামগান ও ইষ্টভাবনায় দিন কাটে। সুলতানপুরের কাছেই রোহরী নামে এক দূরবিস্তারী গহণ অরণ্য ছিল। মাঝে মাঝে নানক সেখানে যেতেন। ধ্যানজপে সারারাত কাটিয়ে বাড়ি ফিরতেন। একবার একটানা তিন দিন তিনরাত তাঁর দেখা মিলল না। রোহরী-অরণ্যে গভীর ধ্যানে সিদ্ধিলাভ করলেন নানক।

অতঃপর নানক লাভ করলেন ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ: নানক! আমি সদা তোমাতেই রয়েছি। এবার থেকে তুমি নির্লিপ্ত, মুক্তপুরুষ হয়ে জীবের উদ্ধারে ব্রতী হও!

পরমানন্দে এবার নানক প্রচারকার্য আরম্ভ করলেন। এ অবস্থায়

চাকরি করা আর সম্ভব নয়; অচিরে নবাব সরকারের কাজ তিনি ছেড়ে দিলেন। তারপর গৃহত্যাগের পালা। পত্নীর ক্রন্দন, বালক পুত্রদ্বয়ের চাহনি, প্রিয় ভগ্নী নান্‌কীর মিনতি কিছুই তাঁর গতি রোধ করতে পারলো না।

পথে প্রান্তরে শ্মশানে উপবনে নানক ঘুরে বেড়ান। প্রচার করেন উপলব্ধ সত্যের বাণী। সঙ্গে চলে মুসলমান মর্দনা।

আপনি কোন্ মঠের? কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত আপনি? এসব প্রশ্নের উত্তরে নানক বলেন: আমার কাছে মঠ সম্প্রদায় বলে কিছু নেই। আমি নিরংকারী, অর্থাৎ যে নিরাকার নিয়েছেন সারা বিশ্ব-সৃষ্টির এই আকার আমি তাঁর ধ্যান করি, তাঁর মহিমা গান করি।

নানক বলতেন, দেশে আজ একটিও হিন্দু নেই, নেই একটিও মুসলমান।

কাজীর কানে সেই কথা পৌঁছলো। সেখান থেকে নবাবের কানে। নানককে তলব করা হলো। নবাব রুক্ষস্বরে কৈফিয়ৎ চাইলেন: তুমি নাকি বলে বেড়াচ্ছো, দেশে হিন্দু নেই, মুসলমানও নেই। তবে কি বলতে চাও এই কাজী সাহেব বা আমি—আমরা অমুসলমান?

নানক সহাস্যে উত্তর দিলেন, পয়গম্বরের উপদেশবাণী সত্য সত্য রূপায়িত যার জীবনে এমন লোক ছাড়া আর কাকে বলবো মুসলমান? এমন লোক কোথায়? আমায় বলে দিন।

—তুমি তাহলে কোন ধর্মীয়?

—আমি কোন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের গণ্ডীর মধ্যে ত' নেই! আমি চলি সেই অনাদি অনন্ত পরম পুরুষের প্রদর্শিত আলোতে। আমার চোখে ধর্মের ভেদরেখা হয়ে গেছে বিলুপ্ত।

সন্ধ্যাবেলা নবাব নানককে আহ্বান জানালেন নমাজে অংশ গ্রহণ করতে। নানক সানন্দে সঙ্গে গেলেন। প্রার্থনাগৃহের এক প্রান্তে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন।

নমাজ শেষ করে কাজী চেপে ধরলেন, কই, তুমি ত' আমাদের সঙ্গে যোগ দাওনি। এই বুঝি তোমার সত্যবাদিতা ?

উত্তরে নানক জানালেন, আপনাকে অনুসরণ করে নমাজ পড়বো এই আশা নিয়েই ত' এসেছিলাম, কিন্তু দেখলাম আপনি বা নবাব কেউ নমাজ পড়েননি !

একথা শুনে নবাব ও কাজী ক্রুদ্ধ হলেন।

—এত বড় কথা ? এর জবাবদিহি তোমায় করতে হবে নইলে কঠোর দণ্ড !

নানক সহাস্যে উত্তর দিলেন, কাজী সাহেব ! আপনার ঘোটকীর এক বাচ্চা হয়েছে কিছুদিন আগে। বাড়ির অঙ্গনে সেটা ঘুরে বেড়ায়। পাশেই রয়েছে এক কুয়ো। বুঝি বাচ্চাটা সেখানে পড়ে যায় এই দুশ্চিন্তাতেই আপনি আচ্ছন্ন ছিলেন নমাজের সময়। আর নবাব সাহেব ! আপনার মন নমাজ ছেড়ে বিচরণ করছিলো কান্দাহার অঞ্চলে একরাশ টাকা দিয়ে আপনি সেখানে লোক পাঠিয়েছেন ঘোড়া কেনবার জন্য !

সব কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। কারুর অস্বীকার করার উপায় নেই। অতঃপর যথোপযুক্ত সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে নানককে তাঁরা বিদায় দিলেন।

এবার আরম্ভ নানকের পরিব্রাজক জীবন। আর পরিব্রাজনের পথে বহু নরনারীর জীবনে ঢেলে দেন করুণা, প্রকাশ করেন যোগবিভূতি।

সেদিন তিনি সঈদপুরে। লালু নামক এক ছুতোর পরম সমাদরে তাঁকে বাড়ি নিয়ে সেবাযত্ন করতে লাগলো। সেই সময় পাঠান সুবাদার দেওয়ান মালিক ভাগো পুণ্য অর্জনের জন্য শহরে পীর ফকির ও গরীব নরনারীদের ভোজন করাচ্ছিলেন। দলে দলে লোক গেল সেখানে। মালিক ভাগো শুনলেন নানকের কথা। তিনি একদিনও তাঁর ভাণ্ডারায় এলেন না দেখে ভাগো তাঁকে ডেকে পাঠালেন। এবং তাঁর আচরণের কৈফিয়ৎ চাইলেন।

নানক বললেন, কেন আসিনি তা বুঝিয়ে দেবো দেওয়ান সাহেব। আপনার গৃহে প্রস্তুত করা পুরী-মালপোয়া-মিষ্টি আনুন। লালুও আনুক তার বাড়ির তৈরী রুটি। নানকের ইচ্ছামত দুজনারই আহার্য বস্তু যখন পাশাপাশি রাখা হলো তখন নানক মালিক ভাগোর খাদ্যগুলি হাতে নিয়ে নিংড়াতে থাকলেন। সকলের বিস্ময় বিমূঢ় দৃষ্টির সামনে সেই খাদ্য থেকে ঝরতে লাগলো টাটকা রক্তধারা। আবার লালুর খাদ্য থেকে নিঃসৃত হলো শুভ্র সুপেয় গোদুগ্ধ। এদৃশ্য দেখে মালিক ভাগোর দম্ভ ধূলিসাৎ হয়ে গেল। নানকের চরণে পতিত হয়ে বারবার কৃপাভিক্ষা করতে লাগলেন।

সঈদপুর ত্যাগ করে যাবার পথে রাত্রির জন্য নানক ও মর্দানা সুজন নামক এক বিশিষ্ট ব্যক্তির আতিথ্য গ্রহণ করেন। লোকটি দেখতে পরম ধার্মিক, মুখে মধু ঝরে। কিন্তু সুজন যে আসলে ছদ্মবেশী দস্যু, রাত্রে অতিথিদের হত্যা করে সর্বস্ব অপহরণ করে, নানক স্বীয় যোগবিভূতি বলে ধরে ফেললেন। সুজন নানকের পায়ে লুটিয়ে পড়ে কাতর প্রার্থনা করলো, প্রভু! আমি মহাপাপী, আমায় উদ্ধার করুন।

নানকের কৃপায় সুজনের রূপান্তর ঘটে গেল।

আর এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে রাবী নদীর তীরে বাতলা নামক স্থানে। নানক বটবৃক্ষতলে সদলবলে বসে নামগান করেন, দলে দলে হিন্দু মুসলমান আসে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে। এই দেখে এই অঞ্চলের প্রতাপশালী জমিদার করোরিয়া রুষ্ট হয়ে স্থির করলেন, একে দূর করতে হবে ওখান থেকে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যতবারই তিনি নানকের দিকে অগ্রসর হন ততবারই একটা না একটা দুর্ঘটনায় পতিত হন। এমন কি, দৃষ্টি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেন তিনি। অবশেষে তাঁর ভুল ভাঙে এবং দৈন্যভাবে পায়ে হেঁটে গিয়ে নানককে জানিয়ে আসেন প্রণতি। বলেন, আমার একান্ত ইচ্ছা এখানকার উর্বর ভূমিগুলি আপনার কাছে আমি দান করি। দয়া করে অনুমতি দিন। এখানে

আপনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠুক নতুন গ্রাম, নতুন সমাজ। নানক সহাস্যে বললেন, এ সংসারে সব ভূমির মালিক 'করতার' —অর্থাৎ যিনি দৃশ্যমান সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। আমি অনুমতি দিলাম। আজ থেকে এ স্থানের নাম হোক করতারপুর।

মাঝে নানক একবার তালোয়ান্দি ফিরে যান ধর্মপ্রাণ রায় বুলারের সঙ্গে শেষ দেখা করতে। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন রায় বুলারের শেষ দিন আসন্ন।

মুসলমান সুফী সাধকদের অনেকেরই সঙ্গে নানকের অন্তরঙ্গতা ছিল। তাঁদের মূল ধর্মস্থান মক্কা মদিনা দেখার ইচ্ছা তাঁর মনে জাগে তাই ভক্ত মর্দানাকে সঙ্গে করে একবার তিনি সারা মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণ করে আসেন। সেবার তিনি কিছুদিনের জন্য মক্কায় অবস্থান করেছেন। মুসলমান ভক্তদের তখন নমাজের সময়। নানক ভাবতন্ময় হয়ে শয্যায় শুয়ে আছেন, কাবা-শরীফের দিকে তাঁর পাদুটি প্রসারিত। কাবার মাতোয়ালী তা দেখে গর্জে উঠলেন ঃ ওরে দরবেশ, তোর এত বড় সাহস। খোদার পবিত্রস্থান কাবার দিকে তুই পা রেখেছিস? নানক শায়িত অবস্থায় উত্তর দিলেন, বেশ ত যে দিকে তোমার কাবা-শরীফ নেই সেদিকেই না হয় সরিয়ে দাও আমার পা।

কথিত আছে, নানকের পা দুটি এই সময় টেনে সরাতে গিয়ে তারা দেখে, যে দিকেই তাঁর পা সরানো হয় সেদিকেই কাবা-মসজিদ। নানক একজন যোগবিভূতিসম্পন্ন উচ্চস্তরের সাধক এবিষয়ে আর তাদের সন্দেহ থাকে না। মক্কা থেকে মদিনা, বাগদাদ ও অন্যান্য অঞ্চল ঘুরে ভারতে ফিরে আসেন।

দিল্লীতে তখন লোদী বংশীয়দের রাজত্ব চলছে। বহ্‌লুল লোদী সিংহাসনে। তাঁর আত্মীয় দৌলতখান তখন পাঞ্জাবের এক বৃহৎ ভূভাগের শাসনকর্তা। বাবরের আক্রমণের মুখে তাঁর সেনাদল ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ঘটনাচক্রে মুঘল সৈন্যরা নানক ও মর্দানাকে বন্দী করে নিয়ে যায়। পথে নানকের অলৌকিক শক্তির পরিচয়

পেয়ে সুযোগমত বাবর শাহকে তারা একথা জানায়। বাবর স্বয়ং তার সঙ্গে দেখা করেন ও শ্রদ্ধা জানান। এবং নানকের ইচ্ছামত সঈদপুরের সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দেন।

পাঞ্জাবের প্রান্তদেশে হাসান-আব্‌দল এক উষর স্থান। শিখেদের অন্যতম প্রধান তীর্থ পাঞ্জা সাহেব সেখানে অবস্থিত। নানকের পাঞ্জা বা হাতের ছাপ আছে সেখানকার এক পাথরে, আর আছে নানকের যোগবলের নিদর্শন এক ঝরণার জলধারা। তৃষ্ণার্ত মর্দানাকে স্থানীয় ফকীর তাঁর কুয়ো থেকে জল দিতে অস্বীকার করেছিলেন, কারণ নানক তাঁর সঙ্গে দেখা করেন নি। এই কথা শুনে নানক তখনই স্বীয় বিভূতি বলে ফকীরের কুয়োর সব জল টেনে নিয়ে নিজের পায়ের কাছে সৃষ্টি করেছিলেন ঝরণার জলধারা।

নানক পরিব্রাজনকালে পুরী ও মথুরায় গিয়েছিলেন। মথুরায় তাঁরই আশীর্বাদে এক ভক্ত সাধকের অন্ধত্ব ঘোচে। সেই সাধক গোবিন্দজীর কাছে প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন। নানক নামক এক মহাপুরুষ মথুরায় আসবেন এবং তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেবেন।

নানকপন্থী শিখদের গুরু গ্রন্থসাহিব জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম-গ্রন্থ। গ্রন্থসাহিবের বাণীগুলি শিখেরা বিভিন্ন রাগের মধ্য দিয়ে গান করেন। নানকের শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন ভাই-বুধা, পরে যাঁর নাম হয় রামদাস। এই ভক্তকে নিয়ে নানক একবার পরি-ব্রাজনে বেরিয়েছেন। তখন গ্রীষ্মকাল, চারিদিকে পুকুর-ডোবা সব একেবারে শুকিয়ে গেছে। ভাই-বুধার ত' তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাবার উপক্রম। শঙ্কিত হয়ে পড়লেন তিনি। এমন সময় নানক আশ্বাস দিলেন, ভয় পেয়ো না, সামনে চলে যাও, জল দেখতে পাবে।

এগিয়ে গিয়ে পুষ্করিণী পেলেন ভাই-বুধা, কিন্তু তা একেবারে শুষ্ক। ফিরে এসে জানালেন নানককে। নানক হেসে বললেন, দেখছি তুমি গুরু সৎনামের উপর এখনও নির্ভর করতে শিখলে না। ওয়াহ্ গুরু বলে আবার সেখানে যাও, নিবিষ্ট মনে জপ করো সৎনাম। জল পাবে।

সত্যি তাই হল। বিস্মিত হয়ে দেখলেন ভাই-বুধা, পুষ্করিণীর তলদেশ থেকে বেগে উৎসারিত হচ্ছে স্নিগ্ধ সুপেয় জলধারা। এই পুনরুজ্জীবিত পুষ্করিণীর নাম দেওয়া হয় অমৃত-সায়র। উত্তরকালে এইখানেই গড়ে ওঠে বিখ্যাত শিখ-স্বর্ণমন্দির। কিছুদিন পরের কথা গুরু নানক বুঝতে পারলেন এ মরদেহ ত্যাগ করার সময় সমাগত। এক শুভলগ্নে সকল শিষ্যকে নিয়ে তিনি এক প্রকাশ্য 'দেওয়ান'-এর অনুষ্ঠান করলেন। প্রিয়তম শিষ্য অঙ্গদকে বসিয়ে দিলেন নিজের আসনে। শিখসঙ্ঘের এই নব নির্বাচিত গুরুকে সর্বাগ্রে নিজে করলেন অভিবাদন। তারপর ধর্মসভা ত্যাগ করে ধীরে ধীরে গিয়ে বসলেন নদীতীরে এক বৃক্ষতলে। সহস্র সহস্র নরনারী সমবেত হল তাঁর সামনে। শেষ ধর্মোপদেশ দান করলেন গুরু নানক। সমাপ্ত হল প্রিয় ভজন। তারপর নয়ন দুটি নিমীলিত হল চিরনিদ্রায়।

শংকরদেব

আসামের বৈষ্ণবগুরু শংকরদেব একাধারে কবি ও সাধক ছিলেন। দেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং সাহিত্যিক উৎকর্ষ-সাধনে শংকর-দেবের অবদান অবিস্মরণীয়। যাঁরা অধ্যাত্মজগতের সন্ধানী তাঁরাও আশ্চর্য অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন এই সাধক-কবির কাছ থেকে!

শংকরদেব যখন জন্মগ্রহণ করেন আসাম তখন ছোট ছোট অনেকগুলি অঙ্গরাজ্যে বিভক্ত। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব লেগেই ছিল।

নিরাপত্তার অভাব ছিল সর্বত্র। অন্ধবিশ্বাস, অজ্ঞতা, নৈতিক অবনতি, সবকিছু মিলিয়ে দেশটার তখন চরম অবস্থা। দীর্ঘকালব্যাপী তন্ত্রের প্রভাব ইতিমধ্যে শিথিল হয়ে গিয়েছিল। এ-হেন অবস্থায় শংকরদেবের মত একজন মহাপুরুষের আবির্ভাবের যেন বড় প্রয়োজন ছিল। তাঁর জীবনবাণী ও সাহিত্যকর্ম সমগ্র দেশটাকে এক অটুট গ্রন্থিতে বেঁধে রক্ষা করলো।

নওগাঁর নিকটবর্তী আলিপুখুরীতে এক কায়স্থ ভূঁইয়া বংশে শংকর দেবের জন্ম। তাঁর পিতা কুসুম্বর ছিলেন স্থানীয় সমাজের সজাতিসম্পন্ন নেতাস্বরূপ। নিকটবর্তী এক সংস্কৃতপণ্ডিতের টোলে শংকরদেবকে ভর্তি করে দেওয়া হয়। সেইখানেই তাঁর সাহিত্য ও ধর্মগ্রন্থাদি পাঠের সুযোগ ঘটে। এবং তিনি ঐসব বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

বাইশ বৎসর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। বাবার বিষয় সম্পত্তি দেখা ও সংসারকর্মে ব্যস্ত থাকাই হলো তাঁর প্রধান কাজ। এই নিয়েই তিনি সুখে কালাতিপাত করছিলেন। সহধর্মিণী সূর্যদেবী ছিলেন ধর্ম-প্রাণা ও পতিগতপ্রাণা মহিলা। কিন্তু বিবাহের চার বৎসর পরে

এলো দুর্দৈব। ভেঙে গেল তাঁর সুখের সংসার। স্ত্রী মারা গেলেন, বাবাও দেহ রাখলেন তার অল্পকালের মধ্যেই। ভগ্নহৃদয় শংকরদেব একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়ে একদিন বেরিয়ে পড়লেন তীর্থ পর্যটনে। দীর্ঘ বারো বৎসর তিনি উত্তরভারতের তীর্থক্ষেত্রসমূহে পরিব্রাজনে কাটালেন। বহু সাধকের সংস্পর্শে এলেন। এই সময় অনেক বৈষ্ণব সাধকের প্রভাব অনুভব করেন শংকরদেব এবং এই মতবাদের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। দেশে প্রত্যাবর্তন করে শংকরদেব এক শক্তিশালী বৈষ্ণবগোষ্ঠী গঠন করলেন এবং বারদোভা নামক স্থানে যে 'সাত্রাস' বা আশ্রম গঠন করলেন তা অদূরভবিষ্যতে আসামের পুনরুজ্জীবনের সহায়ক হলো। উক্ত আশ্রমে ধর্মালোচনা হতো, দলে দলে লোক যোগদান করতো। বিভিন্নস্থানে নাম-গ্রহ প্রতিষ্ঠা করে-ছিলেন শংকরদেব। গ্রামে গ্রামে নামগৃহগুলি হয়ে ওঠে শুভ মিলন ক্ষেত্র, ভক্তিমূলক সংগীতের মাধ্যমে গড়ে ওঠে ঐক্য আর শুচিভাব। কীর্তনের সমবেত সুরে জাগে শুভচেতনা।

শংকরদেব প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের অপর নাম একশরণ ধর্ম। বিষ্ণু অথবা, নারায়ণে আত্মসমর্পণই সে-ধর্মের মূল মন্ত্র। এমন সহজ ও আকর্ষণীয় ছিল তাঁর মতবাদ যে সর্বসাধারণের পক্ষে তা হয়ে ওঠে সহজগ্রাহ্য। সংসারত্যাগ কৃচ্ছ্রসাধন বা অনুরূপ চরমপন্থী কোন মতের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। তিনি বলতেন: নারী পুরুষ তাদের সাধারণ গার্হস্থ্যজীবন পালন করবে, সংসারধর্ম করবে, তার সঙ্গে সঙ্গে করে যাবে বিষ্ণু পূজা।

শংকরদেবের এই সরল সহজ মতবাদে আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে লোকে তাঁর পাশে জড় হতে লাগলো। বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তি সমাজে বেড়ে গেল এমন যে শেষপর্যন্ত সমকালীন শাক্তসমাজ শত্রুতা আরম্ভ করে দিল। আসামের অহোম্ রাজকূল ছিলেন শাক্তধর্মী। তাঁদের গুরুরা শংকরদেবের বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করলেন এবং বিষয়টি এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছলো যে একদিন শংকরদেবের ডাক পড়লো

রাজদরবারে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি সমাজকে বিপথগামী করছেন। এই অভিযোগের উত্তরে তাঁর বক্তব্য পেশ করবার সুযোগ দেওয়া হলো। শাক্ত পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নামতে হলো শংকরদেবকে। সে-যুদ্ধে জয়লাভ করলেন তিনি। কিন্তু এর পর ঐ রাজ্যে অবস্থান যে নিরাপদ নয় এই কথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো এবং শংকরদেব অল্পকালের মধ্যেই কুচবিহারের মচ্ রাজের অধীনস্থ বরপেতায় চলে এলেন। জীবনের শেষভাগে তিনি এই স্থানেই অতিবাহিত করেন।

আর একবার তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছিলেন শংকরদেব এবং এই যাত্রায় তিনি পুরীতে শ্রীচৈতন্যদেবের সংস্পর্শে আসেন। কৃষ্ণপ্রেমী চৈতন্য অবতারের সঙ্গে তাঁর এই যোগাযোগ এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

শংকরদেব ভাগবত অনুবাদ করেন। তাঁর রচিত বারগীত ও অঙ্কীয় নাট (একাঙ্ক নাটিকাগুচ্ছ) অসমীয়া সাহিত্যের এক অমর সম্পদ। এই সাধক-কবির সাহিত্যকর্ম অসমীয়া সমাজকে যে সমৃদ্ধি ও শুচিতা দিয়েছে তার তুলনা হয় না!

১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে শংকরদেব মরদেহ ত্যাগ করেন। আজও তিনি আসামের অদ্বিতীয় ভাব-নায়ক।

শ্রীচৈতন্য

নিমাই পণ্ডিত (অপর নাম পণ্ডিত বিশ্বম্ভর) গয়া থেকে নবদ্বীপে ফিরেছেন। কিন্তু এ যেন একেবারে নূতন মানুষ। বিদ্যার অভিমান, কূটতর্কের বিলাস আজ আর নেই। আজ তিনি নিরভিমান আত্ম-ভোলা বৈষ্ণব। সর্বদা কৃষ্ণবিরহে মুহ্যমান। কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করেন আর গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রুধারা। নবদ্বীপের লোক অবাকবিস্ময়ে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে আর ভাবে: কেমন করে রাতারাতি এমন রূপান্তর ঘটে গেল ?

পণ্ডিত বিশ্বম্ভর গিয়েছিলেন গয়ায় পরলোকগত পিতার পিণ্ডদান করতে। ফল্গুনদীতে স্নান সেরে তিনি বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশ করলেন। দলে দলে ভক্ত তীর্থযাত্রীরা আসছে, শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছে। এদিকে পাণ্ডার দল, ওদিকে পুরোহিত, চারদিকে এক পবিত্র ভক্তি-ভাব। এইসব দেখতে দেখতে তরুণ নিমাই পণ্ডিতের সর্বাঙ্গে এক ভাবতরঙ্গ খেলে গেল। থরথর করে তাঁর দেহ কাঁপতে লাগলো, দুচোখ ছাপিয়ে অবিরল অশ্রু ঝরতে লাগলো, ভক্তিরসের আবেশে তিনি আত্মহারা হলেন। নিমাই ভাবাবেশে মূর্ছা যাচ্ছিলেন এমন সময় এক বৈষ্ণব তাঁকে ধরে ফেললেন, তাঁর বাহ্যজ্ঞানহীন দেহটাকে বুকে আশ্রয় দিয়ে আদর করতে লাগলেন। এই বৈষ্ণব হলেন ভাগবত ঈশ্বরপুরী, সমকালীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবসাধক। মহাত্মা মানবেন্দ্র পুরীর ইনি অন্তরঙ্গ শিষ্য। নবদ্বীপে ঈশ্বরপুরীর যাতায়াত ছিল। তরুণ অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে সেখানেই তাঁর আলাপ। জ্ঞান ফিরে আসা মাত্র নিমাই ঈশ্বরপুরীকে চিনতে পারলেন, তাঁকে প্রণাম করে কাতর হয়ে বললেন, "প্রভু, কৃপা করে আমায় মন্ত্র দিন, চরণে

আশ্রয় দিন। এই অনিত্য সংসারের বন্ধন থেকে মুক্ত হবার মন্ত্র আমায় দিন। কি করে কৃষ্ণলাভ হবে আমায় বলে দিন, প্রভু।

নিমাইয়ের আকুতি দেখে কয়েকদিনের মধ্যেই ঈশ্বরপুরী তাঁকে দীক্ষা দিলেন। বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত সেদিনের নিমাই হলেন পরবর্তী কালের প্রেমভক্তি ধর্মের প্রবর্তক, শ্রীচৈতন্য।

১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ফাল্গুনী পূর্ণিমার পুণ্য-তিথিতে নবদ্বীপধামের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে নিমাই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র, মাতার নাম শচীদেবী। জগন্নাথ মিশ্রের পৈত্রিক নিবাস ছিল শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে। বিদ্যাচর্চার জন্য নবদ্বীপে এসেছিলেন। স্বীয়অধ্যাপক নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা শচীদেবীকে বিবাহ করে নবদ্বীপেই থেকে যান। জগন্নাথ মিশ্রের প্রথম পুত্র বিশ্বরূপ যৌবনেই ঘর ছেড়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। মিশ্র দম্পতি মুহ্যমান হয়ে পড়েন। এরপর আর এক দুর্দৈবের আঘাত যখন এলো, নিমাইয়ের বয়স তখন দশ-এগারো। সামান্য কয়েক দিন রোগে ভুগে বৃদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। বালক নিমাইকে নিয়ে শচীদেবীর বিপদের অন্ত রইলো না। মায়ের একমাত্র আশা-ভরসাস্থল নিমাই। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীর ছাত্র সে। অতুলনীয় মেধা, নয়ন-ভোলানো রূপ। কিন্তু বড় দুরন্ত। তার দুষ্টামি ও দৌরাত্ম্যে পাড়ার লোক, সারা নবদ্বীপের লোক অতিষ্ঠ। ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনতে শুনতে শচীদেবীর কান ঝালাপালা হয়। আঠার বছরবয়সে টোলের পড়া শেষ করে নিজেই টোল খুললেন, তখন আর সে বাল-চঞ্চলতা নেই। তখন তিনি অসামান্য প্রতিভা-ধর কূটতার্কিক; নবীন প্রবীণ সকলেই তাঁর ভয়ে ভীত, তাঁকে এড়িয়ে চলতে পারলেই যেন বাঁচে। পুত্র এবার অধ্যাপক। নবদ্বীপ শহরের বর্ধিষ্ণু লোক মুকুন্দসঞ্জয়, তাঁর বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপে নবীন অধ্যাপক নিজস্ব টোল খুলেছে। সংসারের আর্থিক সাচ্ছল্যও বেশ কিছুটা হয়েছে। শচীদেবী ছেলের জন্য উপযুক্ত পাত্রী খুঁজতে লাগলেন। অবশেষে

বল্লভ আচার্যের সুলক্ষণা কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে তাঁর মনে ধরলো। বধূ-রূপে তাকেই ঘরে তুললেন।

দিন যায়। নিমাই পণ্ডিতের অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় পেয়ে একদল যেমন ভীত হয়, অন্য দল তেমনি হয় মুগ্ধ। এই সময় একদিনের ঘটনায় নিমাইয়ের লোকোত্তর স্বরূপটি নবদ্বীপবাসীর কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। কাশ্মীরের প্রথিতযশা পণ্ডিত আচার্য কেশব মিশ্র নবদ্বীপে এসে উপস্থিত হন এবং রীতিমত হাঁকডাক শুরু করে দেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা শুনে নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ বেশ কিছুটা ভীত হয়ে পড়েন। একদিন গঙ্গাতীরে হঠাৎ আচার্য কেশবের সঙ্গে নিমাইয়ের দেখা হয়ে গেল। দুই জনের মধ্যে আলাপ পরিচয় হলো। কথাপৃষ্ঠে নিমাই বললেন : পণ্ডিতবর ! শুনেছি আপনার কবিত্বশক্তি অতুলনীয়। আপনার সামনেই প্রবাহিতা রয়েছেন মুক্তিদায়িনী ভাগীরথী। কৃপা করে একটা নূতন গঙ্গাস্তোত্র রচনা করে আমায় শুনিয়ে দিন, পাপ মোচন হোক।

কেশব মিশ্র তৎক্ষণাৎ ঝড়ের মত সদ্যরচিত স্তব আবৃত্তি করলেন। চারিদিকে শ্রোতারা বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে শুনলো তাঁর দীর্ঘ রসমধুর রচনা। নিমাইয়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসতে লাগলেন আচার্য কেশব। এরপর নিমাই সবিনয়ে আরম্ভ করলেন শ্লোকের সমালোচনা। শব্দ ও ভাবের অশুদ্ধি, ভুল অলঙ্কার প্রয়োগ, সব কিছু ত্রুটি খুঁটিয়ে দেখিয়ে দিলেন নিমাই। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করলে কি হয়, নিমাই তাঁকে কোণঠাসা করে ফেললেন ! পরের দিন ভোর না হতেই কেশব মিশ্র স্বয়ং নিমাইয়ের কাছে গিয়ে হাজির। একেবারে দীনভাব। আর তিনি নবদ্বীপে থাকলেন না। পরাজয় স্বীকার করে পালালেন। এই ঘটনার পর নবদ্বীপে নিমাইয়ের প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে যায়।

কিছুদিন পর নিমাই একবার পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে যান। সেখান থেকে ফিরে এসে শোক সংবাদ পেলেন, তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মীদেবী সর্পদংশনে মারা

গেছেন। এখন থেকে তিনি অধ্যাপনার কাজে আরও মন দিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা শুনে দূরদূরান্তর থেকে ছাত্র আসতে লাগলো, ধনী ও গণ্যমান্য লোকেরা তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করতে লাগলেন। প্রাচুর্যে ভরে গেল তাঁর সংসার। শচীদেবী নিমাইয়ের আবার বিয়ে দিলেন সনাতন পণ্ডিতের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে। সংসার আলো করে এলো নববধূ। শচীদেবী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

কয়েক বছর কাটলো বেশ সুখে আর আনন্দে। কিন্তু গয়াধামে পৌঁছবার পর হঠাৎ খসে পড়লো নিমাইয়ের পুরানো খোলস, ঘটে গেল রূপান্তর। ভক্তিসিদ্ধ মহাবৈষ্ণব ঈশ্বরপুরী নিমাইয়ের কানে যে-নামমন্ত্র ঢেলে দিলেন তার প্রতিক্রিয়া হলো সুদূরপ্রসারী। নিমাই নবদ্বীপে ফিরে এলেন এক নূতন মানুষ। আর সেই গৃহী অহঙ্কারী নিমাই পণ্ডিত নয়, মাতৃভক্ত পুত্র, পত্নী-প্রেমিকস্বামী বা ছাত্রপ্রাণ অধ্যাপক নয়। যে-মানুষটি ফিরলেন, তিনি কৃষ্ণ-বিরহে কাতর। মহাপ্রেমিক, সাধক। কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের পিয়াসে, কৃষ্ণবিরহের দুঃসহ দহনজ্বালায় তিনি অধীর। মুখে শুধু এক কথা, আমার কৃষ্ণ কই? অধ্যাপকবৃত্তি ও বিদ্যাবৈভব ত্যাগ করে নিমাই হলেন প্রেমের কাঙাল। পাঠগ্রহণের জন্য ছাত্রের দল সাগ্রহে তাঁকে ঘিরে বসে কিন্তু ব্যাকরণগ্রন্থ খোলা অবস্থায়ই একপাশে পড়ে থাকে। প্রিয় ছাত্রদের নিয়ে নিমাই পরম আনন্দে নামকীর্তন শুরু করে দেন :

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥

এই সময় নবদ্বীপে একটি ক্ষুদ্র বৈষ্ণবগোষ্ঠী ছিল। জনসমাজে এঁদের কিন্তু কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল না। তাঁরা নিমাইয়ের এই নূতন রূপ দেখে আনন্দে আত্মহারা হলেন এবং তাঁর মধ্যে খুঁজে পেলেন তাঁদের নূতন নেতাকে। শ্রীবাস গদাধর, মুকুন্দ প্রভৃতি সকলে নিমাইয়ের প্রাঙ্গণে এসে জড়ো হতে থাকেন। নামকীর্তন করেন। তখনকার দিনে বাংলার বৈষ্ণবদের মধ্যে অদ্বৈত আচার্য ছিলেন নেতৃস্থানীয়। জ্ঞান ও

ভক্তিরসের অপূর্ব প্রকাশ ছিল তাঁর মধ্যে। বহু ভক্ত এই বৈষ্ণব মহাপুরুষের আশ্রয় ও সাহায্য পেয়ে কৃত-কৃতার্থ। ভক্ত যবন হরিদাসও তাদের মধ্যে একজন। একদিন অদ্বৈতের সঙ্গে নিমাই মিলিত হলেন। তাঁকে দেখামাত্র অদ্বৈত আনন্দে অধীর হলেন, যেন এই রূপ দর্শনের জন্যই তিনি এতদিন পথ চেয়ে ছিলেন। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে নিমাইকে পূজা করলেন তিনি। শ্রীঅদ্বৈতের সেদিনকার এই স্বীকৃতি নবদ্বীপের বৈষ্ণবের সামনে এক অপূর্ব মর্যাদা এনে দিল। এবার তিনি হলেন শ্রীগৌরাঙ্গ, গৌরসুন্দর।

শ্রীবাসের অঙ্গনে কীর্তনবিলাস চলতে থাকে নিয়মিত। কৃষ্ণপ্রেমে সর্বদা মাতোয়ারা হয়ে থাকেন শ্রীগৌরাঙ্গ। এই অবস্থায় তিনি এক দিন তাঁর পার্ষদদের ডেকে বললেন, "এই নবদ্বীপে একজন উচ্চকোটি মহাপুরুষ আত্মগোপন করে আছেন। তোমরা তাঁর সন্ধান করো। আমি তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য বড় ব্যাকুল হয়েছি।" ভক্তেরা মহাবিপদে পড়লেন। কে সেই মহাপুরুষ! তাঁকে ত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! এই অবস্থায় শ্রীগৌরাঙ্গ একদিন নিজেই সকলকে নিয়ে সোজা নন্দন আচার্যের গৃহে উপস্থিত হলেন। যে মহাপ্রেমিক সন্ন্যাসীকে তিনি সেদিন আবিষ্কার করে নিয়ে এলেন তাঁর নাম শ্রীনিত্যানন্দ। সেদিন থেকেই নিমাই-নিতাই বা গৌর-নিতাই অবিচ্ছেদ্য নাম, নিত্যানন্দ হলেন শ্রীগৌরাঙ্গের প্রধান পার্ষদ। ঠিক এমনি ভাবেই তিনি পাশে টেনে আনলেন চট্টগ্রাম অঞ্চলের মহাবিলাসী ও ধনী পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে, দরিদ্র শ্রীধরকে, মুসলমান ভক্ত হরিদাস ও আরও অনেককে।

গৌরাঙ্গ স্থির করলেন, তাঁহার প্রেমভক্তির ধর্মকে এবার তিনি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করবেন। এই কাজে নিয়োগ করলেন দুই শ্রেষ্ঠ পার্ষদ, নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে। অর্থাৎ একজন সর্বত্যাগী হিন্দু আর একজন সর্বত্যাগী মুসলমান। একদিন প্রভুর এই পার্ষদদ্বয় সোল্লাসে নামগান করতে করতে নবদ্বীপের পথে চলেছেন।

হঠাৎ পথ রোধ করে দাঁড়ালো দুই ভাই জগন্নাথ ও মাধব। অর্থাৎ জগাই মাধাই। সাক্ষাৎ যমদূত যেন। দুজনেই পাষণ্ড বর্বর। হরিনাম শুনলেই মারমুখী হয়ে ছুটে আসে। মাধাই ওদের কৃষ্ণনামে উত্তেজিত হয়ে পথ থেকে কলসীর কানা তুলে নিত্যানন্দের মাথায় আঘাত করে রক্ত ঝরিয়ে দিল। এই দেখে জগাই কিন্তু বিচলিত হলো এবং মাধাইকে তিরস্কার করলো। জগাই না রুখলে সেদিন হয়তো মাধাই এক হত্যাকাণ্ড করে বসতো। এই সংবাদ শুনে শ্রীগৌরাঙ্গ হুঙ্কার দিয়ে ছুটে এলেন পাপিষ্ঠদের সাজা দিতে। কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভুকে নিরস্ত করলেন, বললেন,—ওরা মহাপাপী। ওদের আপনি কৃপা করুন। শ্রীগৌরাঙ্গ জগাইকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করলেন, আশীর্বাদ করলেন। আর এই ক্ষমার ফলে জগাই লুটিয়ে পড়লেন গৌরাঙ্গের পায়ে। অনুতাপ-দগ্ধ মাধাইও ক্ষমা চেয়ে নিলেন। প্রভুর কৃপাপ্রসাদ পেয়ে দুই দুর্বৃত্ত জগাই মাধাই পরবর্তীকালে হয়ে ওঠেন পরমভাগবত।

গৌরাঙ্গের নব প্রবর্তিত প্রেমভক্তির ধর্ম ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। চারিদিকে কেবলই শোনা যায় হরিনামের জয়ধ্বনি। কেবলই খোল করতাল নিয়ে নাম সংকীর্তন। বৈষ্ণবগোষ্ঠীর এই নাম কীর্তনকে শাসক কাজী বার্-বাহক সুনজরে দেখতেন না। তিনি সরকারী আদেশ জারী করলেন, এখন থেকে নবদ্বীপে সমবেত ভাবে ও উচ্চস্বরে কীর্তন করা চলবে না। এই শুনে গৌরাঙ্গ ক্রোধে রুদ্রমূর্তি ধরলেন। বললেন, নবদ্বীপের পথে আজ সন্ধ্যায় নগরকীর্তন হবে। আমি পুরোভাগে থাকবো, দেখি, কে বাধা দেয়।

এ এক অভিনব বিদ্রোহ। সংঘাত নয়, সংঘর্ষ নয়, শুরু হলো গৌরাঙ্গের অহিংস অভিযান। সমগ্র ভারতের ইতিহাসে এরকম রাজবিরোধী অহিংস অভিযানের কথা পূর্বে শোনা যায়নি। এমন অভাবনীয় জনসমুদ্র দেখে কাজী ভয় পেলেন। নিজের ভুল বুঝতে

পারলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর পূর্ব আদেশ তুলে নিলেন। প্রভুর এই সময়কার এক অলৌকিক লীলার কাহিনী এইরূপ।

প্রতিদিনকার মত সেদিনও শ্রীবাস অঙ্গনে নামকীর্তন হচ্ছিল। প্রভু ভাবাবেশে সমাধিস্থ। জ্ঞান ফেরা মাত্র তিনি হঠাৎ প্রশ্ন করলেন শ্রীবাসের বাড়িতে কি কোনো অমঙ্গল ঘটেছে? আমার আজ আনন্দে মন বসতে চাইছে না কেন?

এক শিষ্য জানালেন, হ্যাঁ প্রভু! শ্রীবাসের এক শিশুপুত্র কদিন অসুস্থ ছিল। সে দেহত্যাগ করেছে।

"সে কি কথা! পণ্ডিত শ্রীবাস আমায় একথা বলেননি কেন?"

"আপনার কীর্তন-আনন্দ ভঙ্গ করতে চান নি তিনি।"

এই কথা শোনা মাত্র প্রভু ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে মৃত শিশুর শয্যার কাছে এলেন। তাঁর স্পর্শে মৃত শিশুর দেহে ধীরে ধীরে প্রাণ ফিরে এলো। তখন শোকার্ত আত্মীয়স্বজনের দিকে ফিরে প্রভু বললেন, এই শিশুকে আমি একটি প্রশ্ন করি।

তাকে লক্ষ্য করে তিনি প্রশ্ন করলেন: তোমার শোকার্ত মা-বাবা আত্মীয়স্বজনকে ছেড়ে তুমি কেন যাচ্ছো এবং কোথায় বা যাচ্ছো, বাছা!

উপস্থিত সকলে সবিস্ময়ে শুনলেন সেই শিশুর উত্তর: শ্রীবাস পণ্ডিতের পুত্ররূপে আমার কর্মফলের শেষ ভোগ ছিল। তা সাঙ্গ হলো, আর কারুর সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। আমি এখন অন্য মার্গে চলেছি। প্রণাম!

শিশু আবার নিঃসাড় দেহে শয্যায় পড়ে রইলো। তবু আত্মীয়-স্বজনের শোকোচ্ছ্বাস অনেকটা প্রশমিত হলো এই লীলায়। প্রভু বোঝালেন, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই।

কিছুদিন যাবৎ গৌরাঙ্গ সংসার ত্যাগ করার কথা গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন। ভাবছিলেন, গৃহ না ছাড়লে, নবদ্বীপ না ছাড়লে

তাঁর প্রেমভক্তি ধর্ম বিশ্বমানবের কল্যাণে লাগাবেন কি করে? এখানে মায়ের স্নেহ, স্ত্রীর প্রেম আর শিষ্যদের বন্ধন চারিদিকে। এ-বন্ধন ছিঁড়ে বাইরে না গেলে লোকে তাঁর কথা শুনবে কেন?

আর কোন কথা নয়। যেমন ভাবা তেমন কাজ। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষ। গভীর রাত্রে গৌরসুন্দর চিরদিনের জন্য গৃহত্যাগ করলেন। পিছনে ফেলে গেলেন বৃদ্ধা মাতা শচীদেবীকে, তরুণী পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া-কে, আর অগণিত ভক্তবৃন্দকে।

কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট তিনি দীক্ষা নিলেন। নবীন সন্ন্যাসীর নামকরণ হলো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

দীক্ষার পর দ্রুত গতিতে তিনি যাত্রা করলেন নীলাচলের দিকে। পুণ্যধাম পুরীর শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেললেন, পাগলের মত জগন্নাথ বিগ্রহকে তিনি বুকে জড়িয়ে ধরতে গেলেন। পাণ্ডা ও প্রহরীদের মধ্যে শোরগোল পড়ে গেল। সংবিৎহারা প্রভু ভূতলে পড়ে গেলেন। রাজপণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম এই সময় শ্রীজগন্নাথ দর্শনে এসেছিলেন। তরুণ সন্ন্যাসীর নয়নাভিরাম মূর্তি ও প্রেম বিহ্বলতা দেখে তাঁর মন গলে গেল। তাঁকে স্বগৃহে নিয়ে গেলেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই এই অসাধারণ নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক পণ্ডিত চৈতন্যকে স্বীকার করে নেন তাঁর জীবন-মরণের প্রভুরূপে। অচিরেই চৈতন্যের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

এরপর রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রদেশ-শাসক রামানন্দ রায় তাঁকে প্রভুরূপে বরণ বরেন। দক্ষিণাপথ পরিব্রাজন কালে অনেককেই তিনি আকর্ষণ করেন তাঁর প্রেমভক্তিরসের ইন্দ্রজালে। দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত ভারতী গোস্বামী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। শ্রীরঙ্গ, রামেশ্বর, ত্রিবাঙ্কুর, পন্ঢরপুর প্রভৃতি দক্ষিণাপথের বহুতর অঞ্চল পর্যটন করে দুবছর পরে গৌরাঙ্গ নীলাচলে ফিরে এলেন। গৌড় থেকে গৌরাঙ্গের প্রধান পার্ষদগণ দলে দলে নীলাচলে এসে পৌঁছলেন। এই সময় উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র চৈতন্যের চরণে আত্মসমর্পণ করেন।

একদিন গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দকে নিভৃতে ডেকে বললেন, শ্রীপাদ ! আমি ত চিরজীবনের জন্য ঘরসংসার ছেড়ে চলে এলাম। কিন্তু গৃহী-ভক্তদের দেখবে কে ? সংসারী জীবের উদ্ধার কি করে হবে ? আমার অনুরোধ, তুমি গৃহে ফিরে যাও, বিয়ে করে সংসারজীবনে প্রবেশ করো। অগণিত গৃহীভক্ত তোমার আদর্শে অনুপ্রাণিত হোক, আদর্শ গৃহী-বৈষ্ণব সৃষ্টি হোক্। প্রভুর নির্দেশে নিত্যানন্দ দেশে ফিরলেন, গার্হস্থ্যধর্ম গ্রহণ করলেন।

গৌরাঙ্গের ইচ্ছা বৃন্দাবন ও মথুরায় যাওয়া। একটিমাত্র সেবক নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। বৃন্দাবনে পৌঁছে শুরু হলো তাঁর নৃত্যকীর্তন ও প্রেমাবেশ। দিব্য ভাবাবেশে আবিষ্ট হয়ে তিনি ব্রজ-মণ্ডলের বহু প্রাচীন লুপ্ত তীর্থ পুনরুদ্ধার করেন। শুধু তাই নয়, সে সময় মথুরা ও বৃন্দাবনের অবস্থা বড় শোচনীয়। এই অঞ্চলের বনাকীর্ণ জনপদগুলি প্রভু ও তাঁর শক্তিমান শিষ্যদের চেষ্টায় আবার জাগ্রত ও সমৃদ্ধ হয়।

বৃন্দাবন ত্যাগের পর প্রভু প্রয়াগের পথে রওনা হন। সঙ্গে শিষ্য বলদেব ভট্টাচার্য ও কৃষ্ণদাস। পথে এক জায়গায় তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়েন। এই সময় এক অশ্বারোহী পাঠান ফৌজ সেই পথে যাচ্ছিল। পাঠানেরা মনে করলো, সঙ্গীরা লোকটিকে বিষপ্রয়োগ দ্বারা হত্যা করছে। এই সন্দেহে বাসুদেব ও কৃষ্ণদাসকে তারা বধ করতে গেল। এমন সময় গৌরাঙ্গের সংবিৎ ফিরে এলো। তিনি পাঠানদের সব কথা বুঝিয়ে বললেন। সৈন্যরা বলদেব ও কৃষ্ণদাসকে ছেড়ে দিল। পাঠানদের সেনাপতি ছিল বেশ পণ্ডিত লোক। চৈতন্যের দিব্যকান্তি ও প্রেমাবেশ দেখে বড় আকৃষ্ট হন। প্রভুর সঙ্গে অধ্যাত্ম আলোচনা আরম্ভ করে এমন অভিভূত হলেন যে শেষ পর্যন্ত তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করলেন। আশ্রয় দিয়ে প্রভু তাঁর নাম দিলেন রামদাস। এই দলে আর একজন ধর্মপ্রাণ তরুণ ছিলেন। তাঁর নাম বিজ্‌লি খাঁ। ইনিও গৌরাঙ্গের কৃপালাভ করেন।

গৌরাঙ্গ প্রয়াগে এসে যখন পৌঁছলেন তখন তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন শ্রীরূপ। গৌড়ের বাদশাহ হুসেন শাহের প্রাক্তন সচিব ইনি, উপাধি সাকর মল্লিক। কিছুদিন পর রূপের বড় ভাই সনাতনও হুসেন শাহের চাকরি ছেড়ে চলে আসেন এবং গৌরাঙ্গের সঙ্গে মিলিত হন। সাধক সনাতন দৈন্য, বৈরাগ্য ও প্রেমভক্তির মূর্ত বিগ্রহ হয়ে ওঠেন।

চৈতন্যের প্রেমভক্তির প্রচার কাশীতে এবার কিছুটা শুরু হয়। ক্রমে ক্রমে স্থানীয় পণ্ডিতেরা তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন। অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী প্রবোধানন্দের তখন কাশীতে বড় প্রতাপ। তিনি বিভিন্নস্থানে গৌরাঙ্গের নিন্দা করতেন, তাঁকে উপহাস করতেন। একদিন তিনি প্রভুর বাহ্যজ্ঞানশূন্য অপরূপ দিব্যমূর্তি দেখে এমন হয়ে গেলেন যে তাঁর এত দিনের বিচার-বিশ্লেষণের অহঙ্কার লুপ্ত হলো এবং তাঁর পদধূলি নিলেন।

গৌরাঙ্গ পুনরায় ফিরে এলেন নীলাচলে, আবার মাতিয়ে তুললেন সকলকে তাঁর নামকীর্তনে। সপ্তগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জমিদার অধিকারী বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী রঘুনাথ এই সময় বিষয়-সম্পত্তির মায়া কাটিয়ে চৈতন্যের আশ্রয় নেন।

বারো লক্ষ টাকার জমিদারী ছেড়ে এসে রঘুনাথ ত্যাগ ও অভিমান-শূন্যতার নিদর্শন দিলেন নীলাচলের সিংহদ্বারে অন্নভিক্ষা করে। চৈতন্যদেব নিজে যেমন কঠোরব্রত পালন করতেন, তরুণ বৈষ্ণবশিষ্যদের জন্যও তেমনি বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্রব্রতের ব্যবস্থা করতেন। আচার-আচরণে বা সাধন-জীবনে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য যে তিনি সহ্য করতেন না, অনেক ঘটনা থেকে তা জানা যায়। ভক্ত জগদানন্দ পণ্ডিত একবার প্রভুর শয্যাকে কোমল ও আরামপ্রদ করবার জন্য সযত্নে তুলার নরম তোষক বালিশ তৈরী করে দেন। আর একবার তিনি গৌড় থেকে ফেরার সময় প্রভুর জন্য এক হাঁড়ি সুগন্ধি চন্দন-তেল এনেছিলেন। দুইবার গৌরাঙ্গ তাঁকে তিরস্কার করেছিলেন এবং বিলাসদ্রব্য বর্জন করেছিলেন।

দীর্ঘকাল নীলাচলে অতিবাহিত করেন শ্রীগৌরাঙ্গ। সেইখানেই

তাঁর অন্তর্ধান ঘটে। এ বিষয়ে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। শেষের দিকে প্রায় সব সময়ই তিনি দিব্যোন্মাদ অবস্থায় থাকেন। ভাবাবেশে কখন কোথায় চলে যেতেন ঠিক থাকতো না। কখনো সিংহদ্বারের কাছে, কখনও বা সমুদ্রতীরে। এক পূর্ণিমার রাত্রে জ্যোৎস্না-ঝলমল সমুদ্রকে যমুনাভ্রমে তিনি ভাবোন্মাদ হয়ে দিলেন সমুদ্রগর্ভে ঝাঁপ। এক ধীবরের জালে শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রাণরক্ষা হয়।

১৪৫৫ শকাব্দ, আষাঢ় মাস। বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর। এক দিব্য ভাবাবেশে আবিষ্ট হয়ে প্রভু জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করলেন। হঠাৎ একসময়ে অন্তর্গৃহের দ্বার বন্ধ হয়ে গেল। সবাই বাইরে,—ভিতরে রইলেন শুধু প্রভু আর জগন্নাথ! বাইশ বছর পূর্বে প্রথম দর্শনের দিনটিতে এমনি আত্মহারা হয়ে পুরুষোত্তম বিগ্রহকে কোলে তুলে নিতে ছুটেছিলেন তিনি। আজও শ্রীবিগ্রহকে তেমনি কোলে নিতে গেলেন। মুহূর্তমধ্যে এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটে গেল। তিনি চিরতরে অন্তর্হিত হলেন। বহু খোঁজাখুঁজিতে প্রভুর মরদেহের সন্ধান পাওয়া গেল না! চৈতন্যদেব যে লীলা করে গেলেন, তা চিরন্তন, শাশ্বত! কবি তাই বলেছেন :

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥

তুলসীদাস

আকাশে মেঘের ঘনঘটা, সন্ধ্যা নামো-নামো। তুলসীদাস দ্বিবেদী বড় চিন্তিত হয়ে স্বগৃহে ফেরার জন্য ত্রস্তপদে রওনা হলেন যজমানবাড়ি ছেড়ে। ফিরে এসে দেখেন, স্ত্রী ঘরে নেই। আরও চিন্তিত হলেন তুলসীদাস। প্রতিবেশীরা খবর দিল, বাবার কঠিন অসুখের সংবাদ পেয়ে রত্নাবলী পিত্রালয়ে গেছে। তুলসীদাসের অভিমান হলো। স্ত্রীকে ছেড়ে তিনি কখনও থাকেননি। সে-বিরহ তাঁর অসহ্য। পাড়ার লোক তাঁকে স্ত্রৈণ মোহান্ধ প্রভৃতি কত কি বলে, টিটকারী দেয়, তবুও তুলসীদাস গায়ে মাখেন না। এবারও তিনি লোকলজ্জা ভুলে সেই ঝড়বাদল মাথায় করে শ্বশুরালয়ে ছুটলেন। দুর্যোগ মাথায় করে অবশেষে সিক্ত দেহে, ছিন্ন বস্ত্রে উদ্‌ভ্রান্তের মত পৌঁছলেন সেখানে। এ-দৃশ্য দেখে সকলের বিস্ময়ের সীমা রইলো না। কুটুম্বের শ্লেষ ও বিদ্রূপ বর্ষিত হতে লাগলো। লজ্জায় ক্ষোভে দুঃখে রত্না মাটিতে মিশে গেল যেন। ক্রোধে জ্বলে উঠলো তার আয়ত নয়ন। কঠোর স্বরে ভৎসনা করে উঠলো স্বামীকে : আজ আমি বেশ বুঝতে পেরেছি আমার প্রতি তোমার আকর্ষণ প্রেমের নয়, মোহের। এই হাড়-মাংসের দেহটার পেছনে যে-আসক্তি দেখিয়েছো, তা ভগবান রামচন্দ্রের পায়ে নিবেদন করলে তরে যেতে! ছিঃ, ছিঃ! বড় অতর্কিত, বড় তীব্র রত্নার এই আঘাত। রত্না শুধু তিরস্কার করলো না, সশব্দে গৃহের দ্বার বন্ধ করেও দিল। ধীর পদক্ষেপে তুলসীদাস পথে এসে দাঁড়ালেন।

তুলসীদাসের সামনে বাহির-দুয়ার সেদিন বন্ধ হলেও ভিতর-দুয়ার হঠাৎ গেল খুলে।

রত্না পরম রূপলাবণ্যবতী, রত্না পরম গুণবতীও। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন তুলসীদাস বিবাহের পর এমন একটি রত্নকে পেয়ে নিজেকে

তরুলতার মত নির্ভরশীল করে তুলেছিলেন। আজ সেইখান থেকেই এলো আঘাত। জীবনের কেন্দ্র থেকে আজ তিনি বিচ্যুত, একেবারে নিরাশ্রয়। সহসা মানসলোকে ভেসে উঠলো নবদূর্বাদলশ্যাম শ্রীরঘুনাথের মূর্তি। কি মধুর কি অন্তরঙ্গ সেই মূর্তির হাতছানি! আর ঘরে ফেরা নয়। অনুতপ্তা রত্নার ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি কানে ভেসে আসছে, কিন্তু না,—আর ফেরবার উপায় নেই! গৃহত্যাগী হলেন তুলসীদাস।

সেদিনকার এই গৃহত্যাগী যুবকই উত্তরকালের গোস্বামী তুলসীদাস, উত্তরভারতের শ্রেষ্ঠ ভক্তকবিরূপে লক্ষ লক্ষ মানবের জীবনমূলে যিনি যুগ যুগ ধরে রামনামের রসধারা সিঞ্চন করে আসছেন।

প্রয়াগের কাছে বান্দা জেলার রাজপুর গ্রামে ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে তুলসীদাস জন্মগ্রহণ করেন। পরাশর গোত্রীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আত্মারাম দ্বিবেদী তাঁর পিতা। মাতার নাম হুলসী দেবী। তাঁর জন্মের কিছুকাল পরেই জনক-জননীর লোকান্তর ঘটে। শৈশব কাটে দুঃখ কষ্ট ও অবহেলায়। পিতার গুরুদেব নরসিংদাস তুলসীকে লালনপালন করেন। শিক্ষাদীক্ষা, শাস্ত্রাধ্যয়ন হয় তাঁরই তত্ত্বাবধানে। পরে নিকটবর্তী গ্রামের দীনবন্ধু পাঠকের কন্যা রত্নাবলীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

কোথায় যাবেন, কে জানিয়ে দেবে ইষ্টলাভের পন্থা, কিছুই জানা নেই তুলসীর, কিন্তু তবু তিনি পথ চলতে লাগলেন। মনে পড়লো বারাণসীর কথা; ভারতের প্রাণকেন্দ্র বহু সাধক ও আচার্যের বাসভূমি বারাণসী তাঁকে আকর্ষণ করলো। সেদিকে পা বাড়ালেন। অন্তরে মুক্তির সংকল্প মুখে নিরন্তর রামনাম। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বহু কষ্টে কাশীতে এসে পৌঁছলেন তুলসীদাস। আশ্রয় পেলেন বিখ্যাত শাস্ত্রবিদ্ সনাতন দাসের টোলে। তুলসী সেখানে শাস্ত্র অধ্যয়নে ব্রতী হন, আর সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে ইষ্টদেব রঘুনাথজীর কীর্তন। দৈহিক অশন, বসন দুঃখের প্রতি দৃষ্টি নেই, তুলসীদাস এখন একান্ত নিষ্ঠায় সাধনায় রত।

ভজনকুটিরের কাছেই একটা গাছ ছিল। তুলসীদাস প্রতিদিন প্রত্যুষে সেখানে ঘটির জল ঢালতেন। ঐ বৃক্ষে বাস করতো এক ব্রহ্মদৈত্য। তুলসীদাসের প্রদত্ত জলে মিটতো তার পিপাসা। প্রসন্ন হয়ে একদিন সে তুলসীকে বললো: আমি তোমার কি উপকার করতে পারি বলো!

—বর দিন, আমি যেন ইষ্টলাভ করি! প্রেত খল্‌খল্‌ করে হেসে বললো: সে কি গো! এত শক্তিই যদি থাকবে তাহলে নিজের এমন দুর্ভোগ হবে কেন? তবে তোমায় সন্ধান দিতে পারি সেই সত্যকার পথ প্রদর্শকের। দশাশ্বমেধ ঘাটের কিছুটা উত্তরে রোজ রামায়ণ পাঠ হয়। সেখানে এক কোণে দেখবে এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নীরব নিশ্চল হয়ে বসে আছেন। সকলের শেষে তিনি স্থানত্যাগ করেন। তাঁর কাছে তুমি যাও। সেই ছদ্মবেশী বৃদ্ধই হলেন পবনন্দন হনুমান।

নির্দিষ্ট রামায়ণের আসরে গিয়ে তুলসীদাস দেখলেন, সত্যই তাই। সভাশেষে তুলসী তাঁকে ধরে বসলেন। সে কি আকুল ক্রন্দন তাঁর। ভক্তরাজ মারুতি করুণার্দ্র হয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন। তুলসীর শিরে বর্ষিত হলো কৃপাধারা। মারুতিই কৃপাভরে নবরূপ ধারণ করে তুলসীদাসকে সাধনমার্গের সংকেত দিয়ে গেলেন।

মাসের পর মাস কাটে। কিন্তু ইষ্ট সাক্ষাৎ ত' মেলে না! তুলসীদাস অধীর হয়ে আবার চেপে ধরলেন ছদ্মবেশী মহাবীরজীকে।

—বৎস! আগামী পরশু পবিত্র রামনবমী তিথি। ঐদিন নিজের কুটিরে বসেই তুমি প্রভু রামচন্দ্রজীর দর্শন পাবে!

প্রতীক্ষায় রইলেন তুলসীদাস। তাঁর ব্যাকুল প্রতীক্ষাকে ব্যাহত করে একসময়ে দ্বারপ্রান্তে কোলাহল আরম্ভ করে দিল এক বেদে ও বেদেনী। বাঁদর নাচ দেখাতে এসেছে। পিছনে ভিক্ষাঝুলি স্কন্ধে এক সুদর্শন তরুণ। তুলসীদাস বিরক্ত হয়ে তাদের তাড়িয়ে দিলেন। তখনও তিনি বুঝতে পারেননি, রামচন্দ্রজী মা জানকী, লক্ষণ আর পবননন্দন হনুমান গিয়েছিলেন তুলসীদাসের দ্বারে ছদ্মবেশে;

পরদিন সে-ভুল তাঁর ভাঙলো যখন ঘাটের সেই বৃদ্ধ মারুতি বললেন, চেয়ে ছাখো! আমার গলায় এখনও দড়ির দাগ রয়েছে। বেদের দলকে তুমি চিনতে পারোনি!

অনুশোচনায় কাঁদতে লাগলেন তুলসী। আবার নিমজ্জিত হলেন কঠোর তপস্থায়। তাঁর সেই সাধনার তীব্রতা দেখে পুনরায় একদিন মহাবীরজী বললেন, তুলসী! তুমি এবার চিত্রকূট পর্বতে যাও। শ্রীরামের পাদস্পর্শে পবিত্র ঐ পর্বতে কিছুদিন তপস্যা করো, ফল পাবে!

তাই গেলেন তুলসীদাস। তখন সূর্যগ্রহণের মেলা ভেঙেছে। চিত্রকূটের বনস্থলী প্রায় জনশূন্য। তুলসীদাস সকালবেলা চন্দন ঘষছেন। এমন সময় কোথা থেকে এক সুন্দর সুঠাম শ্যামতনু বালক এসে হাজির। আয়ত নয়নে দিব্য দ্যুতি। আজানুলম্বিত বাহুতে ছোট একটি ধনুক। তুলসীর কাছে বায়না ধরলো, আমায় একটু চন্দন পরিয়ে দাও। আচ্ছা ফাঁপরে পড়লেন তুলসীদাস। বালক নাছোড়বান্দা। হঠাৎ তুলসীর মনে পড়লো রামনবমীর দিনে সেই ছলনার কথা। বালকের কপালে চন্দন এঁকে দিয়ে কম্পিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন:

বালক শুনহু বিনয় মম এহুঁ।
তুম শ্রীরামচন্দ্র কি দস্যুর কেহুঁ?

কণ্ঠস্বরে সুধা ছড়িয়ে বালক উত্তর দিল—সকল শ্রীরাম অবতারা।

আঃ! কি আনন্দ! এ আনন্দের যে আর পারাপার নেই। তুলসীদাস আত্মসংবিৎ হারিয়ে ফেললেন।

প্রভু রঘুনাথজী আর একদিন তুলসীদাসকে দর্শন দেন ও বলেন, আমার লীলাকাহিনীকে তুমি এবার জনমানসের কাছে তুলে ধর। তোমার অপরূপ ভাবৈশ্বর্য ও কাব্য সুষমায় মণ্ডিত করে সমাজের সর্বস্তরে তা বিতারণ কর!

এই আদেশ পেয়ে তুলসীদাস প্রভুর সমস্ত লীলাস্থল পরিক্রমা করে বেড়ান। উত্তর ভারতের সমস্ত তীর্থ দর্শন করলেন। অযোধ্যার

সরযূতীরে কিছুদিন বাসও করলেন তুলসীদাস। বৃন্দাবনে কোন মন্দিরে রামসীতার মূর্তি না পেয়ে বড় মনমরা হয়ে যান তিনি। মদনমোহনের বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে কাতর প্রার্থনা করলেন তুলসীদাস, প্রভু! তুলসী যখন তোমার চরণে মাথা নোয়াবে তখন কিন্তু তোমায় ধনুর্বাণ নিতে হবে। বাঁশীতে আর চলবে না।

কথিত আছে, মদনগোপালজী সেদিন ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলেন।

কাশীধামে ফিরে এসে তুলসীদাস অসিঘাটে নূতন আশ্রয় বেছে নেন গুহায়। তারপর আরম্ভ করেন তাঁর অমরকীর্তি রামচরিতমানস। বহু গ্রন্থ পাঠ করে ও অজস্র তত্ত্ব ও রসবস্তু সংগ্রহ করে তুলসীদাস সৃষ্টি করেন এই অনবদ্য সাহিত্যকর্ম। আউধীহিন্দী ও ব্রজবুলির সংমিশ্রণের ফলে এই গ্রন্থ খুব সহজবোধ্য হয়; ফলে অপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তুলসীদাস একাধারে কবি ও দার্শনিক, ভক্ত সাধক ও শক্তিমান যোগী হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। এজন্য আবার কাশীর একদল গোঁড়া ব্রাহ্মণের চক্ষুশূল হয়ে ওঠেন তিনি। তারা তাঁর অনিষ্ট করার চেষ্টা করে। এমনকি, দুটি কুখ্যাত চোরকে তুলসীদাসের ঘর থেকে রামচরিত-মানসের পাণ্ডুলিপি চুরি করার জন্য নিযুক্ত করে। রাত্রে তারা যতবার তুলসীদাসের ঘরে প্রবেশ করার অপচেষ্টা করেছে ততবারই অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছে, একদিব্যকান্তি শ্যামলকিশোর ধনুর্বাণ নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। পরদিন তারা নিজেরাই তুলসীদাসের কাছে গিয়ে স্বীয় অপচেষ্টার জন্য ক্ষমা চেয়েছে এবং শ্যামলকিশোরটির কথা বলেছে। তুলসীদাসের আর জানতে বাকি রইলো না, কে সেই দিব্যকান্তি কিশোর! দুই চোখ বেয়ে দরদরধারায় গড়িয়ে পড়ল অশ্রু।

একব্যক্তি একদিন কাঁদতে কাঁদতে তুলসীদাসের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করে বললো,—আমি ব্রাহ্মণ হত্যা করেছি। রক্ষণশীল পণ্ডিতদের বিধান, আত্মহত্যা ছাড়া এ পাপ থেকে আমার মুক্তি নেই। আমি অনুতাপে জ্বলে পুড়ে মরছি। আপনি আমায় মুক্তিমন্ত্র দিন।

একথা শুনে তুলসীদাস বললেন, সে কি কথা ভাই। সর্বপাপ-হর রামনাম থাকতে তোমায় আত্মহত্যা করতে হবে কেন?

তুলসীদাস তাঁর কানে দিলেন রামনাম মহামন্ত্র।

রক্ষণশীলেরা এ-বিধান মানলেন না এবং রামনামের মাহাত্ম্যের প্রমাণ চাইলেন। মন্দিরের সামনে যে পাথরের বৃষমূর্তি রয়েছে তার মুখের কাছে ঐ ব্রহ্মঘাতক তৃণগুচ্ছ ধরুক, আর ঐ বৃষ জীবন্ত হয়ে গ্রহণ করুক, তবেই বুঝবো তোমার রামনামের গুণে মহাপাপী নিষ্কৃতি পেয়েছে।

তুলসী বললেন, তথাস্তু।

কথিত আছে, সমবেত জনতার সম্মুখে তুলসীর আশ্রিত সেই ব্যক্তির হাত থেকে পাষাণ বৃষ সেদিন আহার্য গ্রহণ করেছিল।

তুলসীদাসের আরও অনেক অলৌকিক শক্তির কাহিনী শোনা যায়। মণিকর্ণিকার ঘাটে একদিন তুলসীদাস ভাবাবেশে এক রমণীকে আশীর্বাদ করেন, মা! পতিপুত্রবতী হয়ে তুমি আনন্দে সংসার কর। রমণী এসেছিলো মৃত পতির সহমরণে। মৃত পতির দিকে তুলসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে যোগৈশ্বর্যবলে ঐ শবকে সেদিন তিনি বাঁচিয়ে তোলেন।

তুলসীদাস দরিদ্রের দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না। সুযোগ পেলেই তিনি আর্ত ও দরিদ্রের দুঃখমোচনে এগিয়ে যেতেন।

তুলসীদাসের যোগৈশ্বর্য সম্পর্কে নানা বিস্ময়কর জনপ্রবাদ দিল্লীর সম্রাট সাহজাহানের কানে পৌঁছায় এবং তিনি তাঁকে দরবারে ডেকে আনেন। বাদশাহ তাঁর অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেতে চান। এই অনুরোধের উত্তরে তুলসীদাস সবিনয়ে বলেন, সম্রাট! আমি রামচন্দ্রজীর এক দীন সেবকমাত্র। আমার সে-সব শক্তি কোথায়!

বাদশাহ মনে করলেন, তুলসীদাস তাঁকে অগ্রাহ্য করলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে সেদিন কারারুদ্ধ করা হলো। কথিত আছে, এর কিছু পরেই রাজধানী বানরের অত্যাচারে ও উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এসব যে রামভক্ত তুলসীদাসের যোগ-বিভূতির লীলা একথা বুঝতে পেরে বাদশাহ তুলসীদাসকে ছেড়ে দিলেন।

১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের বর্ষাঘন দিনে শুক্লাসপ্তমী তিথিতে ভক্তকবি তুলসীদাস মর দেহ ত্যাগ করেন।

তুকারাম

পন্ঢরপুরে, পুণ্যতোয়া ভীমানদীর তীরে নিকটবর্তী বিঠ্ঠল দেশের শ্রীমন্দিরকে কেন্দ্র করে সেদিন উৎসবের মেলা। হাজারে হাজারে লোক আসছে প্রভুজীর জন্য মালাচন্দন আর নৈবেদ্য নিয়ে। আর পাঁচজনের মত ভক্ত তুকারামও এসেছেন সেদিন। বৈরাগ্যবান, মুমুক্ষু এই মারাঠী যুবকের জীবনে প্রভু বিঠ্ঠলজীই হয়ে উঠেছেন সর্বস্বধন। তাঁর একুশ বছরের জীবনে অনেক দুঃখজ্বালা লাঞ্ছনা পেয়েছেন। পেয়েছেন শোক দারিদ্র্যের কশাঘাত। এখন এখানে এসেছেন পরম শান্তি, পরম আশ্রয় পেতে।

ভজন কীর্তন আর নৃত্যের শেষে ক্লান্ত হয়ে তুকারাম এক বট বৃক্ষের ছায়ায় শুয়ে ছিলেন। সেই সময় দেখলেন এক আশ্চর্য স্বপ্ন। দেবদুর্লভকান্তি এক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী এসে দাঁড়ালেন। মুখে তাঁর হরিনাম। তুকারামকে তিনি প্রেমঘন আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে দিলেন নাম দীক্ষা ও আশীর্বাদ।

তন্দ্রা ভাঙলো। অপূর্ব আনন্দাবেশে তুকা মূর্ছিত হলেন। স্বপ্নলব্ধ এই নাম তরুণ ভক্তের জীবনে এক অপরূপ রূপান্তর ঘটালো। স্বপ্নের সেই সন্ন্যাসী স্বীয় পরিচয় দিয়েছিলেন 'বাবাজী' আর তুকাকে জপ করতে বলেছিলেন পবিত্র নাম 'রাম কৃষ্ণ হরি'।

স্বপ্নে আবির্ভূত তুকার এই গুরু লৌকিক জীবনে এক মহাবৈষ্ণব সাধকরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন মহারাষ্ট্র ভূমিতে। বোম্বাই রাজ্যের ওতুর গ্রামে তাঁর সমাধি দেখা যায়।

তুকারামের আবির্ভাব হয় আনুমানিক ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে। পুনার আট ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে দেহু নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

বংশের উপাধি 'মোরে'। জাতিতে তাঁরা বণিক। তুকার পিতার নাম বোহ্লাবা। মাতার নাম কনকাবাঈ। পিতা ও মাতার আকস্মিক মৃত্যুর কিছুদিন পর বড়ভাই সাওজী একদিন গৃহত্যাগ করে কোথায় চলে গেলেন। সারা মহারাষ্ট্রে তখন দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। তুকা তখন বিশেষ দুর্দশাগ্রস্ত হলেন। যে ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন সেটিও নষ্ট হয়ে গেল। তুকা একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেলেন। তুকার পত্নী জিজাবাঈ ছিলেন সঙ্গতিসম্পন্ন ঘরের মেয়ে। শ্বশুরালয়ের সাহায্যে কোনও রকমে সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হলো। এ-সময়ে হঠাৎ একটা মালের কেনাবেচা করে তুকারাম বেশ কিছু অর্থ লাভ করলেন। সানন্দে বাড়ি ফিরছেন তুকা, এমন সময় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর দেখা। ঋণের দায়ে তিনি বিপন্ন, মাথার ওপর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা। ব্রাহ্মণীও কেঁদে আকুল। এ-দৃশ্য দেখে তুকার হৃদয় বিগলিত হলো। সব অর্থ দান করে রিক্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরলেন। আবার সেই দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম। এ অবস্থায় জ্যেষ্ঠ পুত্র সন্তোজীও একদিন রোগে ভুগে ভুগে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।

সংসারের কোলাহল থেকে মাঝে মাঝে তুকা নিজেকে সরিয়ে নেয়। নিকটস্থ ভাম্বনাথ পাহাড়ের নিভৃত অরণ্যে বিঠোবার ধ্যানে থাকেন বিভোর।

তুকার এ-হেন উদাসীনতা দেখে ছোট ভাই কাহ্নাইয়া দাদাকে বিষয়সম্পত্তির প্রতি আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু কোন ফলই হলো না। নিজের অংশের দলিলপত্র তুলে নিয়ে একদিন অকস্মাৎ নদীগর্ভে বিসর্জন দিয়ে বসলেন তুকা।

তারপর, ইন্দ্রায়নীর তীরে বসে নামজপ ও ধ্যান। একদিন এক কৃষক অনুরোধ জানিয়ে গেল : ওহে তুকা! এখানে বসে ত নিষ্কর্মার মত দিন কাটাচ্ছো। আমার ক্ষেতের শস্যগুলো পাহারা দাও না কেন? এজন্য অবশ্য মজুরি দেবো তোমায়!

তুকা রাজী হলেন। কিন্তু, পাহারা দেবেন কি ; পাখির দল, পশুর দল সেই শস্যে উদরপূর্তি করতে থাকে আর তুকা ভাবেন ; আহা পৃথিবীর বুকে যখন ভগবানের সৃষ্ট এতো শস্য তখন ঐ বেচারারা কেন অনাহারে থাকবে ?

ফলে ক্ষেতের শস্য গেল উজাড় হয়ে, পঞ্চায়েতের বিচারে তুকারামের হলো দারুণ লাঞ্ছনা।

এসবে তুকার কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। তাঁর জীবনের যখন একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, ইষ্ট বিঠলজীর নিরন্তর লীলাকীর্তন। সাধকশ্রেষ্ঠ জ্ঞানেশ্বর, নামদেব, একনাথ প্রভৃতির অপূর্ব ভক্তি-সঙ্গীতে মাতোয়ারা হয়ে থাকেন তুকা। ক্রমে এক অদ্ভুত উদ্দীপনা জাগে তাঁর মধ্যে। মারাঠী ভক্ত সাধকদের গ্রন্থ পাঠে তৎপর হন। এর পরই এক সময় তুকারাম বিঠোভাজীর স্বপ্নাদেশ পান। নামদেব যতগুলো অভঙ (অর্থাৎ ভক্তিরসাত্মক গান) রচনা করে যাবেন ভেবেছিলেন তা সফল হয়নি। ভগবানের আদেশে তুকা তা সম্পূর্ণ কারর কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। ভাগবত অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণের লীলাপদাবলী রচনার পর তুকারাম অজস্র ভক্তিরসাত্মক অভঙ রচনা করলেন।

তুকা জাতিতে শূদ্র কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই অনেক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চবর্ণের লোক তাঁর ভক্ত হয়ে পড়লেন। দেহু গ্রামের প্রতাপশালী মোহান্ত মম্বাজী গোঁসাই এই দেখে ক্রোধান্ধ হলেন এবং তুকার ক্ষতিসাধন করবার চক্রান্ত করতে লাগলেন। একদিন গ্রামের পথে কীর্তনরত তুকাকে তিনি কাঁটাগাছের ডাল দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করলেন কিন্তু তবুও সাধক তুকা সেই আঘাতে নামগান ছাড়লেন না বা মম্বাজী গোঁসাইকে কিছু বললেন না।

রাত্রে মম্বাজীর গৃহে উপস্থিত হয়ে তুকাই করজোড়ে বললেন, গোঁসাই ! দোষ আমারই। বহুক্ষণ ধরে আমায় প্রহার করে আপনাকে শ্রান্ত হতে হয়েছে। আপনি আমায় ক্ষমা করুন, দয়া করে আমার কীর্তন প্রাঙ্গণে চলুন !

তুকার এই কথায় মম্বাজী অনুতাপের জ্বালায় দগ্ধ হলেন এবং অবশেষে সাশ্রুনয়নে তাঁর শ্রীচরণে নিজেকে সমর্পণ করলেন।

একবার এক ব্রাহ্মণ সাধক পণ্ঢরপুরের মন্দিরে ধর্না দিয়ে বিঠলজীর আদেশ পেলেন, বৎস! সিদ্ধ মহাত্মা জ্ঞানেশ্বরের আরাধনা কামনা কর, সব কামনা পূর্ণ হবে। জ্ঞানেশ্বরের সমাধিতে ধ্যান করতে করতে ব্রাহ্মণ আবার দৈববাণী শুনলেন, দেহুতে গিয়ে ভক্ত তুকারামের শরণ নাও, মনস্কামনা সিদ্ধ হবে।

ব্রাহ্মণ তুকারামের শরণাপন্ন হলেন। তুকা তাঁকে কয়েকটি নির্দেশ দিলেন এবং কয়েকটি অভঙ রচনা করে দিলেন। প্রসাদ স্বরূপ তাঁর হাতে দিলেন একটি নারিকেল। ব্রাহ্মণ তুচ্ছ মারাঠী ভাষায় রচিত অভঙ ও সামান্য নারিকেল প্রসাদে তেমন তৃপ্ত হলেন না। শোনা যায়, কোণ্ডবা নামে আর এক ব্রাহ্মণ এই অভঙ ও নারিকেল ভক্তিভরে গ্রহণ করেন। এবং নারিকেলের ভিতর থেকে বহু গুপ্তধন লাভ করেন। কোন এক ধনাঢ্য ভক্ত তুকারামকে কিছু ধনরত্ন দান করে ধন্য হতেচেয়েছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে নারিকেলের ভিতরে গোপনে স্বর্ণ-রত্নাদি পুরে দেন। তুকা ব্রাহ্মণকে যে অভঙ রচনা করে দিয়ে-ছিলেন, উত্তরকালে তা বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং উত্তমজ্ঞান নামে পরিচিত হয়।

রামেশ্বর ভট্ট নামে এক উগ্র রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ তুকারামের উপর অত্যাচার শুরু করেন। ভট্টের সঙ্গে যোগ দিলেন উগ্র সনাতনপন্থী এক জমিদার। তুকারামকে গ্রাম থেকে বিতাড়িত করাই হলো তাদের উদ্দেশ্য। তুকা তথাপি একদিন রামেশ্বরের গৃহে গিয়ে উপস্থিত। তাঁর চরণ বন্দনা করে বললেন, নামগান করে বেড়াই কিন্তু প্রকৃত ভক্তির উদয় আজও যে হলো না। আপনি আমায় পায়ে ঠেলবেন না। আজ থেকে, আপনার আজ্ঞা হবে আমার শিরোধার্য।

—আমার আজ্ঞা মেনেই যদি চলবে বলছো তাহলে তোমার সত্য রক্ষা করো। এক্ষুনি তোমার সমস্ত অভঙ-রচনা ইন্দ্রায়নীর জলে ফেলে

দাও। সত্যরক্ষার উদ্দেশ্যে তুকারাম তাই করলেন! পরক্ষণেই কিন্তু তুকার হৃদয়ে জাগলো তীব্র অনুতাপ। এ তিনি কি করলেন! প্রভু বিঠোবার চরণেই যে তাঁর সমস্ত অভঙ নিবেদিত। নিজের স্বত্ব-স্বামিত্ব তাতে কি আছে?

তেরো দিন তুকারামের অনাহারে কেটে গেল। প্রভুর চরণে বার বার মিনতি জানালেন, আমি মূর্খ, এ মহাসম্পদের মর্যাদা আগে বুঝতে পারিনি। তোমার ধন এবার তুমিই উদ্ধার করে দাও।

পরম ভক্তের এই আবেদন বিঠোবা না শুনে পারেন নি। সেই রাত্রেই আর এক ভক্তকে স্বপ্নযোগে বলেন; তুকাকে তার অনশন ভাঙতে বলো। অভঙগুলো নষ্ট হয়নি। তোমরা জলের নীচ থেকে তা তুলে নিয়ে এসো। পরদিন সকালে পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করা হলো। সকলে সবিস্ময়ে দেখলেন, এতদিন নদীগর্ভে থাকার পরও তার কোনো ক্ষতি হয়নি। এরপর রামেশ্বর ভট্ট তুকারামের চরণে এসে আশ্রয় চেয়েছিলেন এবং উত্তরকালে তাঁর এক বিশিষ্ট ভক্তরূপে পরিচিত হন।

তুকারামের প্রেমভক্তিময় সাধনার খ্যাতি তাঁর অলৌকিক শক্তির নানা বিস্ময়কর কাহিনী এসময় দিকে দিকে প্রচারিত হতে থাকে। চারিদিক থেকে সহস্র সহস্র দর্শনার্থী মুমুক্ষু নরনারী এসে তাঁকে ঘিরে ধরে। ভক্ত তুকার এ-সময়কার জীবন সাধনৈশ্বর্যের নানা অলৌকিকত্বে ভরপুর।

একদিন লোহাগাঁও নামক স্থানে তুকা নামকীর্তনে মত্ত আছেন। এমন সময় একটি দরিদ্রা নারী তাঁর মৃত পুত্রকে কোলে করে সেখানে উপস্থিত। শোকাতুরা মা চীৎকার করে কাঁদতে লাগলো। সে এক করুণ মর্মান্তিক দৃশ্য।—বাবা, আমার ছেলের প্রাণ ফিরিয়ে দাও। যদি তুমি বিঠলজীর সত্যিকারের ভক্ত হও তাহলে অনায়াসে এই জীবন-ভিক্ষা দিতে পারবে। না হলে বুঝবো তোমার নামকীর্তন নিরর্থক।

করুণায় বিগলিত হলেন তুকা; ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে মৃতের দেহ স্পর্শ করলেন, ধীরে ধীরে সেই মৃত চোখ মেলে চাইলো। সিদ্ধ-

পুরুষ তুকার বৈরাগ্যময় জীবন, তাঁর ভক্তি ও প্রেমের ভাবৈশ্বর্য সারা মহারাষ্ট্রকে ধীরে ধীরে উদ্দীপিত করে তোলে।

বিশেষ করে নিম্ন শ্রেণীর ও সাধারণ মারাঠীদের মধ্যে তাঁর ধর্মাদর্শ প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। মারাঠা জাতির পুনরুজ্জীবনে এ কম সহায়ক হয়নি।

মারাঠা-নায়ক শিবাজী ধর্মরাজ্য স্থাপনের একান্ত আগ্রহ নিয়ে তখন সবেমাত্র তোরাণা দুর্গ জয় করেছেন। তিনি মাঝে মাঝে তুকার কাছে যেতে আরম্ভ করেন। তাঁর নিজের সাধনপথের সঙ্গে শিবাজীর অধ্যাত্ম-আদর্শের যে তফাত আছে একথা তুকারাম বুঝেছিলেন এবং তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন রামদাস স্বামীর নির্দেশে চলতে। তাঁর এই পরামর্শের ফল কল্যাণকর হয়। মারাঠার জাতীয় জীবনের উন্মেষে এই পরামর্শ সাহায্য করে।

একবার বিঠল-মন্দিরে তুকার সঙ্গে রামদাসের সাক্ষাৎ হয়। তাঁদের এই মিলন বড় মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে।

১৬৫০ খৃষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসে সাধক তুকারাম দেহু গ্রামেই দেহ-রক্ষা করেন।

ত্রৈলঙ্গ স্বামী

বারাণসী আকাশে প্রভাতের আলোকচ্ছটা। দিকে দিকে রণিত হচ্ছে শিব-শম্ভো-শঙ্কর-হর হর-মহাদেও ধ্বনি।

বেণীমাধবের ধ্বজার কাছেই পঞ্চগঙ্গার প্রাচীন ঘাটে ভক্ত মুমুক্ষু নরনারী দলে দলে স্নানান্তে এসে পরম শ্রদ্ধাভরে গঙ্গাজল, ফুল, বিল্বপত্র অর্পণ করে যাচ্ছে এক মহাকায় উলঙ্গ সন্ন্যাসীর চরণে। নির্বিকার ধ্যানগম্ভীর যোগীর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কাশীধামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কাছে এই মানব-বিগ্রহ তৈলঙ্গ মহারাজ নামে পরিচিত। এই শিবপুরীতে প্রায় দেড়শো বছর ধরে তিনি রয়েছেন।

পৌনে তিনশত বছরের সুদীর্ঘ জীবনে কঠোর তপশ্চর্যার ফলে ত্রৈলঙ্গ স্বামী অর্জন করেন অপরিমেয় যোগবিভূতি।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষপাদের কথা। অন্ধ্রের ভিজিয়ানাগ্রাম অঞ্চল হোলিয়া নামক এক জনপদ ছিল। সেখানকার এক ভূম্যধিকারী ছিলেন নরসিংহরাও। তিনি নিজে যেমন সৎ ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন, তেমনি তাঁর পত্নী বিদ্যাবতী ছিলেন ভক্ত সাধিকা। তাঁদের কিন্তু কোন সন্তান জন্মেনি। নরসিংহ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। বিদ্যাবতী শিবপূজায় বেশীর ভাগ সময় কাটাতে থাকেন। দেবাদিদেবের কৃপায় বিদ্যাবতী অবশেষে একটি সুলক্ষণযুক্ত পুত্রসন্তান লাভ করেন। শিবের করুণায় জন্ম—তাই শিশুর নামকরণ হয় শিবরাম। এই শিবরামই উত্তরকালে ভারতের অধ্যাত্মগগনে আবির্ভূত হন মহাযোগী ত্রৈলঙ্গস্বামী রূপে।

বিদ্যাবতী সেদিন শিবজীর ধ্যানে মগ্ন রয়েছেন। শিশু শিবরাম খেলাধুলার শেষে কোন সময়ে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। পূজার শেষে অকস্মাৎ এক অলৌকিক দৃশ্য দেখলেন বিদ্যাবতী। শিব-বিগ্রহ থেকে

এক অলৌকিক জ্যোতির ধারা নির্গত হয়ে কিছু পরে ভূতলে শায়িত শিশুর দেহে বিলীন হয়ে গেল। ভয় পেয়ে শিশুকে বুকে করে বিদ্যাবতী ঘরে প্রবেশ করলেন এবং স্বামীকে সব কথা বললেন। নরসিংহ সহধর্মিণীকে সান্ত্বনা দিলেন : ভয় পেয়োনা। এ-সন্তান তোমার শিবজীর অংশ।

বালক শিবরাম বড় স্বভাবগম্ভীর। সে যেন শিশুরাজ্যের এক ব্যতিক্রম। খেলাধুলায় তার কোন আসক্তি নেই। যৌবনের উন্মেষেও তার সেই একই উদাসীনতা, বৈরাগ্য ও বিষয়বিরক্তি। নরসিংহ রাও চঞ্চল হয়ে পড়লেন, ছেলের বিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হলেন। মাতা বিদ্যাবতী কিন্তু এই প্রস্তাবে মত দিলেন না। ছেলের ইচ্ছা চিরকুমার থেকে সাধনভজন করবে, মা সেই ইচ্ছা সমর্থন করলেন।

শিবরামের তখন চল্লিশ বছর বয়স, বাবা মারা গেলেন। এর বারো বছর পরে মা বিদ্যাবতীও দেহ রাখলেন। সংসার বন্ধন শিথিল হয়ে গেল। শিবরাম এই বার গ্রামের শ্মশানের একপ্রান্তে পর্ণকুটির বেঁধে অধ্যাত্ম সাধনায় নিমগ্ন হলেন। সাধনকুটিরের একদিকে মহাশশ্মান, আর এক দিকে কল্লোলিনী তটিনী। জীবন-মরণের এই পটভূমিকায় বসে শিবরাম খুঁজতে লাগলেন দুর্জ্ঞেয় মহাসত্যকে। দীর্ঘ বিশ বছর এইখানে সাধনায় কাটালেন। একদিন ফললাভও হলো। কোন এক অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে শ্মশানক্ষেত্রে পর্ণকুটিরে আবির্ভূত হলেন ভগীরথানন্দ সরস্বতী। এই যোগীগুরুর সঙ্গে শিবরাম বেরিয়ে পড়লেন তীর্থে। পুষ্করতীর্থে শিবরাম তাঁর কাছে দীক্ষা নিলেন। সন্ন্যাসাশ্রমে তাঁর নূতন নামকরণ হলো গণপতি সরস্বতী। এ-সময়ে তাঁর বয়স প্রায় আটাত্তর বছর। তেলঙ্গ দেশের লোক বলে কাশীর জনসাধারণ তাঁকে বলতো ত্রৈলঙ্গস্বামী। গুরু ভগীরথ স্বামীজী পুষ্করেই মরলীলা সংবরণ করেন। তারপর প্রায় দশ বছর সেখানে সাধনার পর ত্রৈলঙ্গ-স্বামী আবার তীর্থদর্শনে বেরিয়ে পড়েন। তখন তাঁর বয়স অষ্টাশী।

সেবার স্বামীজী সেতুবন্ধ রামেশ্বরধামে। এক বিরাট মেলা হচ্ছে।

দরিদ্র ব্যাধিগ্রস্ত এক ব্রাহ্মণতনয় এই তীর্থে অকস্মাৎ প্রাণত্যাগ করেন। আত্মীয়স্বজনের বিলাপ ও আর্তনাদ শুনে তাঁর হৃদয় বিগলিত হলো, স্বামীজী কমণ্ডলু থেকে কিছু জল নিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করলেন, তারপর ছিটিয়ে দিলেন মৃতের দেহে। দেখতে দেখতে সে-দেহে প্রাণ সঞ্চার হলো। এই কাণ্ড করে চক্ষের নিমিষেই কিন্তু স্বামীজী অদৃশ্য হলেন। পরে জানাজানি হলো এই সিদ্ধমহাপুরুষ আর কেউ নয়, ত্রৈলঙ্গস্বামী।

একসময় স্বামীজী নেপালের এক গভীর অরণ্যে কঠোর তপস্যায় রত ছিলেন। নেপালের এক রাণা এইসময় সদলবলে শিকারের উদ্দেশ্যে সেই বনে ঢুকেছেন। এক বাঘের সন্ধান পেয়ে কয়েকটি গুলি ছুঁড়লেন কিন্তু বারবারই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। বাঘের পিছনে তাড়া করে গিয়ে হঠাৎ রাণা দেখলেন, এক বিশালকায় সন্ন্যাসীর আসনের কাছে বাঘটি লুটিয়ে পড়েছে এবং সন্ন্যাসী তার গায়ে হাত বুলোচ্ছেন। রাণা ত' বিস্ময়ে হতবাক্। সন্ন্যাসী ইশারায় রাণাকে অভয় দিলেন ও কাছে ডাকলেন। তারপর বললেন, দেখো বাবা, আমার এখানে তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। মন থেকে সব হিংসা দূর করো তাহলে বাঘ তোমার কোনো অনিষ্টসাধনে সক্ষম হবে না। তুমি তাকে প্রেম দাও সে-ও তোমাকে প্রেম ফিরিয়ে দেবে।

এ-খবর কাঠমাণ্ডুতে ছড়িয়ে পড়লো। দলে দলে লোক যেতে লাগলো সেই বনে। ফলে বাধ্য হয়ে স্বামীজী বনাঞ্চল ত্যাগ করলেন। গেলেন তিব্বত ও মানস সরোবর। সেখান থেকে নীচে নেমে আসার সময় একদিন পথিমধ্যে দেখলেন, সাত বৎসর বয়স্ক বালকের মৃতদেহ বুকে করে এক বিধবা উচ্চস্বরে কাঁদছেন। পুত্র শোকাতুরা মাতা হঠাৎ এই তেজোময় বিরাটকায় সন্ন্যাসীকে দেখে মৃতপুত্রকে তাঁর পদতলে শুইয়ে দিলেন। কাতরভাবে পুত্রের প্রাণভিক্ষা চাইলেন। যোগীবরের দুচোখে করুণার অশ্রু নেমে এলো। মৃতদেহ স্পর্শ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে শবের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন দেখা গেল। জননী ও আত্মীয়জনেরা

বালকটিকে ফিরে পেয়ে আনন্দে উন্মত্ত হলেন। ইতিমধ্যে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি অদৃশ্য হলেন।

উত্তরাখণ্ড থেকে নেমে স্বামীজী নর্মদাতীরে মার্কণ্ডেয় ঋষির আঁশ্রমে কিছুদিন ধ্যান ধারণায় রত ছিলেন। নর্মদা-মাঈজীর স্তন্যধারা পান করার তীব্র অভিলাষ জাগলো একদিন স্বামীজীর মনে। দেখতে দেখতে নর্মদার জলস্রোত শুভ্র দুগ্ধধারায় রূপান্তরিত হলো আর স্বামীজী স্রোতমধ্যে দাঁড়িয়ে শিশুর মত পান করলেন।

নর্মদাতটের এই আশ্রমে আট বছর অবস্থানের পর ত্রৈলঙ্গস্বামী প্রয়াগে চলে যান। সেখানেও এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে।

ঘাটে বসে আছেন তিনি। পাশে রামতারণ ভট্টাচার্য নামে এক ব্রাহ্মণ। হঠাৎ প্রবল জলঝড় এলো। রামতারণ স্বামীজীকে বারবার অনুরোধ করলেন নিরাপদস্থানে যেতে। স্বামীজী বললেন, আমার জন্য ভেবো না। ঐ ত্যাখো, দূরের নৌকাযাত্রীদের অবস্থা। ওরা বিপন্ন, বোধ হয় ডুবে যাবে। ওদের বাঁচানো দরকার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তরঙ্গবিক্ষুব্ধ নদীর সঙ্গে যুঝে নৌকাটি নদীগর্ভে তলিয়ে গেল। সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য! রামতারণ আর্তস্বরে কেঁদে উঠলেন। পাশ ফিরে চেয়ে দেখেন স্বামীজী নেই। বিস্ময় চরমে উঠলো যখন তিনি দৃষ্টি ফেরাতেই দেখলেন, নিমজ্জিত নৌকা আবার ভেসে উঠছে আর আরোহীদের সঙ্গে নিয়ে স্বামীজী ঘাটে এসে নামছেন!

স্বামীজীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে রামতরণ বললেন, বাবা! এমন অলৌকিক শক্তি মানুষ কি করে লাভ করে আমায় খুলে বলতে হবে।

স্মিতহাস্যে স্বামীজী বললেন, রামতারণ! ঐশী শক্তি সমস্ত মানবের মধ্যে সুপ্ত আছে। তাকে শুধু জাগিয়ে তুলতে হয়। এ মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়।

এই ঘটনার পর ত্রৈলঙ্গস্বামী বারাণসীধামে আসেন। ১১৪৪ সালের মাঘ মাসে তাঁর আবির্ভাব কাশীধামের জনজীবনে এক

আলোড়ন জাগিয়ে তোলে। সুদীর্ঘ দেড়শত বছর ধরে এই পুণ্যতীর্থে তাঁর যোগৈশ্বর্য-লীলা প্রকট করেন। সকলে তাঁকে 'সচল বিশ্বনাথ' বলতো।

প্রথম দিকে স্বামীজী অসিঘাটে তুলসীদাসের বাগানে বাস করতেন। একদিন লোলার্ককুণ্ডে যাবার পথে দেখলেন রাস্তার ধারে কুষ্ঠ রোগযন্ত্রণায় কাঁদছে একজন। নাম ব্রহ্ম সিংহ, বাড়ি আজমীড় দেশে। স্বামীজীর করুণা হলো। তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। মহাযোগীর দর্শনমাত্র ব্রহ্মসিংহের রোগযন্ত্রণা অন্তর্হিত হলো। সঙ্গে সঙ্গে তার কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হলো শিব-আরাধনার স্তোত্রবাণী।

আর এক ঘটনা ঘটে গঙ্গার ঘাটে। মৃতকল্প এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে ঘিরে জনতার ভিড়। নাম তার সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। যক্ষ্মারোগে এই অবস্থা। স্নানে এসে হঠাৎ তিনি অচেতন হয়ে পড়েছেন। স্বামীজী এগিয়ে গিয়ে সীতানাথকে স্পর্শ করলেন। অমনি বিলুপ্ত চেতনা ফিরে এলো। ঔষধস্বরূপ তার হাতে তুলে দিলেন কিঞ্চিৎ গঙ্গামৃত্তিকা। বললেন, গঙ্গাস্নানের পর প্রতিদিন সেবন করবে। অল্পকালের মধ্যেই সীতানাথ রোগমুক্ত হলেন।

একদিন কাশীর হনুমানঘাটের কাছে এক সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় মহিলা সামনাসামনি ভীমকায় উলঙ্গ সন্ন্যাসী ত্রৈলঙ্গস্বামীকে দেখে নানা কটূক্তি করেন। শ্লেষপূর্ণ তিরস্কার ও ধিক্কার বর্ষিত হলো কিন্তু নির্বিকারভাবে চলে গেলেন স্বামীজী। সেইদিন রাত্রে এক চাঞ্চল্যকর স্বপ্ন দেখলেন মহিলা। বিশ্বনাথ স্বয়ং তাঁর সামনে এসে সক্রোধে বললেন, ছ্যাখ্, যে সংকল্প নিয়ে তুই রোজ আমার পূজা দিচ্ছিস্ তা আমার দ্বারা সিদ্ধ হবে না। যে উলঙ্গ মহাযোগীকে তুই আজ পথের মাঝখানে অপমান করেছিস, তার কৃপাতেই তোর মনস্কামনা সফল হতে পারে।

মহিলার স্বামীর উদরে হয়েছে মারাত্মক ঘা, জীবনের কোন আশাই নেই! তাই নিত্য পূজা দেন বিশ্বনাথ মন্দিরে। এখন কি করা যায়? মহিলা পরদিনই ব্যাকুল হয়ে স্বামীজীর পদতলে গিয়ে পড়লেন।

বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। ত্রৈলঙ্গমহারাজ কৃপাপরবশ হয়ে এক মুঠি ছাই দিয়ে বললেন, এইটে লেপন করলেই তোর স্বামী ব্যাধির কবল থেকে মুক্তি পাবে।

সেবার এক দেশীয় নৃপতি সপরিবারে কাশীধামে তীর্থ করতে এলেন। রানী ও পুরমহিলাদের স্নানের জন্য ঘাট ঘিরে ফেলা হলো। চারিদিকে সিপাহী-সান্ত্রী। কোন এক সময়ে মহাকায় উলঙ্গ সন্ন্যাসী ত্রৈলঙ্গস্বামী সেই ঘেরা জায়গায় গিয়ে উপস্থিত। রাজা ক্রোধে ফেটে পড়লেন। পাহারাধীনে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো প্রাসাদে। খবরটা ছড়িয়ে পড়লো শহরে। ভক্তদের চাপে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হলো কিন্তু কয়েকজন অত্যুৎসাহী রাজানুচর তাঁকে রাস্তায় অপমান করলো। সেইদিন রাত্রে রাজা এক আতঙ্ককর স্বপ্ন দেখলেন, স্বয়ং মহাদেব যেন ত্রিশূল আন্দোলন করে শাসাচ্ছেন, ত্রৈলঙ্গস্বামীকে তোরা অপমান করেছিস ? আজই দূর হ এই শিবধাম থেকে ! ভোর না হতেই রাজা ছুটলেন, নগ্ন সন্ন্যাসীর শ্রীচরণে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চাইলেন। পরম কৃপালু যোগী সহাস্যে অনুতপ্ত রাজাকে আশীর্বাদ করলেন।

স্বামীজীর অলৌকিক শক্তির কথা কাশীধামে খুব বেশী জানাজানি হয়ে যায়। ফলে আধি-ব্যাধিক্লিষ্ট লোক দলে দলে তাঁকে অনুসরণ করে। তাই যোগীরাজের প্রধান আশ্রয় হয়ে ওঠে গঙ্গামাঈ ! যখন-তখন গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলবিহার করেন। একবার গঙ্গার স্রোতে ভাসমানকালে স্বামীজী উজ্জয়িনীর মহারাজার সঙ্গে বালকের মত ক্রীড়াচ্ছলে তাঁর আশ্চর্য অলৌকিক শক্তির পরিচয় দেন। মহারাজার নৌকায় তাঁকে তোলা হলো। সকলে তাঁকে প্রণাম করলো। মৌনী যোগীবর মহারাজার কটিদেশে প্রলম্বিত তরবারিটি নিয়ে খামখেয়ালী শিশুর মত নাড়া চাড়া করতে করতে হঠাৎ গঙ্গাগর্ভে ফেলে দিলেন। যেন এক মজার খেলা !

তরবারিটি উজ্জয়িনীরাজ পেয়েছিলেন ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে তাঁর মর্যাদার স্বীকৃতিস্বরূপ। এ-হেন বস্তু হারিয়ে তিনি

রীতিমত ক্রুদ্ধ হলেন। উন্মত্ত সন্ন্যাসীকে কঠোর শাস্তি দেবেন বলে শাসাতে লাগলেন। নৌকা ঘাটে এসে লাগলো। এমন সময় স্বামীজী মুচ্‌কি হেসে গঙ্গাগর্ভে হাত ডোবালেন। সকলে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে দেখলো, স্বামীজীর হাতে উঠে এসেছে দুটো তলোয়ার। রাজার হাতে দিয়ে তিনি বললেন, আপনার তলোয়ার চিনে নিন্।

রাজা একেবারে হতবুদ্ধি। নিজের তরবারি চিনতে পারলেন না। স্বামীজী হেসে বললেন, মূর্খ! মোহ দম্ভ আর অজ্ঞানে পূর্ণ রয়েছে। যা সঙ্গে যাবার নয়, যে বস্তু নিজের নয়, তার জন্য এত ক্ষোভ ক্রোধ কি ভালো?

এমনি অনেক অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে কাশীবাসী নিত্য ত্রৈলঙ্গ-স্বামীর যোগবিভূতির পরিচয় পেতো। অসিঘাটে সর্পাঘাতে মৃতমানুষের দেহে প্রাণসঞ্চার করে পতি-বিয়োগবিধুরা রমণীর মুখে হাসি ফুটিয়ে-ছিলেন; একদল দুষ্ট লোকের দেওয়া চুনগোলা জল নির্বিকারভাবে নিঃশেষে পান করে এবং পরমুহূর্তে তা মূত্রপথে নিঃসারিত করে স্তম্ভিত করেছিলেন সকলকে। ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজা তাঁকে একবার পট্টবস্ত্র ও স্বর্ণালঙ্কারে সাজিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু রাজবাড়ির বাইরে আসার কিছুপরেই কয়েকটি দুর্বৃত্ত তস্কর যখন তাঁর শরীর থেকে সেই আবরণাদি খুলে নিতে লাগলো, স্বামীজী কোন প্রতিবাদ করলেন না। রাজপ্রহরীরা হঠাৎ সেই দৃশ্য দেখে হৈ-চৈ করলো। এমনকি ধরেও আনলো সেই তস্করদের। মৌনী স্বামীজী কিন্তু ইঙ্গিতে রাজার কাছে তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন।

স্বামীজী উলঙ্গ হয়ে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ান বলে ইংরেজ রাজকর্মচারী কয়েকজন ঘোরতর আপত্তি তোলেন এবং একসময় তাঁকে হাতকড়া পরিয়ে হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু মুহূর্তমধ্যে ঘটে যায় এক অলৌকিক কাণ্ড। প্রহরীবেষ্টিত কামরা থেকে সন্ন্যাসী উধাও। এজলাসকক্ষ তোলপাড় করেও হদিস্ মিললো না, পুলিশ কর্মচারীরা গলদ্‌ঘর্ম। এমন সময় অকস্মাৎ আবির্ভাব সন্ন্যাসীর, সেই একই

জায়গায়। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব একেবারে হতবাক্। বিশিষ্ট ভক্ত উকীল সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটকে স্বামীজীর যোগবিভূতির কথা বললেন। চন্দন ও বিষ্ঠায় এই নির্বিকার পুরুষের সমজ্ঞান। তাই বস্ত্র পরিধানের আবশ্যকতা উনি বোধ করেন না! এই কথা শুনে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের রোখ চাপলো, আরও পরীক্ষা করবেন তাঁকে। ওঁর বিলাতী খানা খেতে হবে বাবাজীকে। একথা শুনে মৌনী মহাপুরুষের বাক্‌স্ফূর্তি হলো। তিনি বললেন, তাইতেই রাজি। কিন্তু তার আগে আমার খানা তোমায় খেতে হবে সাহেব!

এই বলে ত্রৈলঙ্গস্বামী সকলের সামনে আপন হাতের ওপর মল-ত্যাগ করে সাহেবের দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, এই আমার আজ খানা। সকলের সামনেই নির্বিকারভাবে গলাধঃকরণ করলেন সেই বিষ্ঠা। অসামান্য যোগবিভূতির ফলে সেই ঘৃণ্য বস্তু তখন এক সুস্বাদু খাদ্যে রূপান্তরিত হয়েছে, সারা আদালতকক্ষ ভরে গেছে তার সৌগন্ধে। এ-দৃশ্য দেখে তাচ্ছিল্যকারী ম্যাজিস্ট্রেট মাথা নিচু করে স্বীকার করলেন তাঁর যোগ শক্তিকে এবং আদেশ দিলেন, ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী উলঙ্গ অবস্থায় স্বেচ্ছামত এ-শহরে বিচরণ করবেন।

আর এক ম্যাজিস্ট্রেট ত্রৈলঙ্গস্বামীকে হাজতে পুরে রেখেছিলেন একটি রাত। কিন্তু সেই তালাবন্ধ হাজত থেকে স্বামীজী স্বেচ্ছায় বেরিয়ে এসে বারান্দায় পায়চারি করে কর্তৃপক্ষকে হতবাক্ করে দিয়েছিলেন। এই সাহেবেরও চৈতন্যোদয় হয় এবং স্বীয় ভুল স্বীকার করে উলঙ্গ স্বামীজীর যথেচ্ছ বিহার স্বীকার করে নেন।

কাশীর পঞ্চগঙ্গার ঘাটের কাছে নানাস্থানে ও মঙ্গলভট্টের আবাসে স্বামীজী প্রায় আশী বছর বাস করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁকে দর্শন করেছিলেন, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁর কাছে পেয়েছিলেন ত্রিবিধ মন্ত্র, আর যোগী শ্যামাচরণ লাহিড়ীকে দেখে স্বামীজী সস্নেহে সংবর্ধনা করে বলেছিলেন, এ হলো ধুতি পাঞ্জাবি পরা মহাপুরুষ।

ত্রৈলঙ্গস্বামী ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেছিলেন। মঙ্গলভট্টের পৌত্র গোবিন্দ

ভট্টকে ডেকে একদিন অকস্মাৎ তিনি বললেন, বেটা সব! এবার তোরা আমায় বিদায় দে। আমি স্থির করেছি, আজই সমাধিযোগে এ দেহ ত্যাগ করবো!

এই মর্মান্তিক সংবাদে ভক্তরা পীড়াপীড়ি, আবেদন নিবেদন করায় মহাযোগী তাঁর তিরোধানের দিন এক মাস পিছিয়ে দেন।

১২৯৪ সনের পৌষমাসে শুক্লা একাদশীর পুণতিথিতে এই মহাযোগীর অমরাত্মার উৎক্রমণ ঘটে।

রামকৃষ্ণ পরমহংস

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ আমাদের ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। আমাদের দেশ তখন বিদেশীদের দ্বারা শাসিত। তাদের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী আর ইউরোপীয় সংস্কৃতির ঢেউ লেগেছে আমাদের জাতীয় জীবনে। ইংরাজী শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটছে, খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রচারকার্য চলছে পূর্ণ উদ্যমে। মোট কথা, পাশ্চাত্য দেশের প্রচার কৌশল আর উদ্যম রীতিমত প্রভাব বিস্তার করেছে সেই সময়। ইংরাজী শিক্ষা পেয়ে অনেক ভারতীয় তাদের নিজেদের ধর্ম আর সংস্কৃতির উপর আস্থা হারাতে বসেছে। জাতীয় জীবনে জেগেছে বিরাট প্রশ্ন : ভারত তবে কি তার সনাতন পথ থেকে বিচ্যুত হবে ? ভারত কি তবে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করেই বাঁচবে ?

ঠিক এই যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ত্রাতারূপে। পাশ্চাত্য শিক্ষার কেন্দ্রভূমি কলকাতার অনতিদূরে এক গ্রামে বসে তিনি এক দুর্বার আধ্যাত্মিক আলোড়ন সৃষ্টি করলেন। হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৪৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে। তাঁর পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ধর্মভীরু ভক্ত ও সত্যবাদী। কুলদেবতা রঘুবীরের উপর তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। রামকৃষ্ণের জননী চন্দ্রমণিও ছিলেন অত্যন্ত সরলা, করুণাময়ী ও পতিগতপ্রাণা। দারিদ্র্যের মধ্যেও ক্ষুদিরাম ও তাঁর স্ত্রী চন্দ্রমণি পরম শান্তিতে বাস করতেন কুলদেবতার পূজা-অর্চনা করে।

ক্ষুদিরাম একদিন গ্রামান্তর থেকে ফিরছেন। দেহ বড় ক্লান্ত, মাঠের কোণে এক গাছের নীচে বিশ্রাম করতে লাগলেন। ক্রমে নিদ্রাকর্ষণ হলো। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখলেন, কে যেন বলছেন : ওখান থেকে আমায় নিয়ে চল। বাড়ীতে নিয়ে সেবা পূজা কর। ঘুম ভাঙলো। নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দেখলেন অর্ধপ্রোথিত এক শিলা, তার উপর ফণাবিস্তার করে রয়েছে এক বিষধর সাপ।

দেখা গেল শিলাটি রঘুবীর-চক্র। এই শিলাই ঘরে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন ক্ষুদিরাম।

পরিণত বয়সে ক্ষুদিরাম গিয়েছিলেন গয়াতীর্থে। তীর্থদেবতা গদাধর একদিন স্বপ্নে ক্ষুদিরামকে বললেন: তোর ভক্তিনিষ্ঠা আর পবিত্রতায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। আমি শীঘ্রই তোর ঘরে জন্ম নেবো।

এক বৎসরের মধ্যেই চন্দ্রমণি তাঁর চতুর্থ সন্তান প্রসব করেন। স্বপ্নের কথা স্মরণ করে ক্ষুদিরাম তার নাম রাখলেন গদাধর। এই গদাধরই পরে রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে ভুবন আলো করলেন।

বালক গদাধর ছিলেন দেখতে সুন্দর। সদা হাসিখুশি, পরিহাস প্রিয়। প্রকৃতিকে বড় ভালবাসে এই বালক। যখন তখন ঘুরে বেড়ায় গ্রামের আশেপাশে, বনে জঙ্গলে। মাঝে মাঝে তার ভাবাবেশ হয়। উড়ন্ত বলাকার ঝাঁক দেখে আত্মসম্বিৎ হারিয়ে ফেলে। যাত্রাগানে শিব সাজার সময় জটা বাঘছাল আর হাড়ের মালা পরার সঙ্গে সঙ্গে বালক অভিনয়ের কথা ভুলে যায়। শিবের দৈবী আবেশ তাকে আচ্ছন্ন করে।

মিষ্টি তার কণ্ঠস্বর। গ্রামের যাত্রা আর পালাগানে সে অংশ গ্রহণ করে আর লোককে মুগ্ধ করে তার মিষ্টি গানে। ভজন আর কীর্তন অন্যের কণ্ঠে শুনে নকল করে নেয় বালক, আর সেইগুলো আশ্চর্য নিখুঁতভাবে গেয়ে শোনায় সকলকে। অল্পবয়সেই বালক আয়ত্ত করে নিলো রামায়ণ, মহাভারত আর ভাগবত পুরাণ। স্কুলের লেখাপড়ায় কিন্তু মন বসে না মোটেই। দাদা রামকুমার শাসন করলে গদাধর জবাব দেয়: তোমাদের ঐ টাকা রোজগারী শিক্ষায় আমার দরকার নেই। ফলে, স্কুলে পড়া আর এগোয় না বালকের।

পিতার মৃত্যুর পর এক অদ্ভুত ভাবান্তর আসে গদাধরের জীবনে। অনেক সময় একলাই ভূতির খালের শ্মশানে অথবা নির্জন আমবাগানে সময় কাটায়। কখনো বা লাহাবাবুদের পান্থনিবাসে যায়। সেখানে

পুরীগামী পরিব্রাজক সাধু বৈরাগীদের আড্ডায় গদাধর কৌতূহলভরে তাঁদের আচার আচরণ লক্ষ্য করে আর তাঁদের কাছে ভজন শেখে।

বয়স ক্রমেই বেড়ে চলেছে, এমনভাবে কতদিন গদাধরকে রাখা যায়! সংসারে অভাব অনটন। বড় ভাই রামকুমার অবশেষে তাঁকে নিয়ে এলেন কলকাতায়। গদাধরের বয়স তখন সতেরো।

রামকুমার কলকাতায় টোল খুলে বসেছিলেন। ছাত্রাভাবে টোল উঠে গেল। সেই সময় রাণী রাসমণির নব প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দিরের জন্য এক পুরোহিতের দরকার পড়ে। রামকুমারের ডাক পড়লো। তিনি পৌরোহিত্য গ্রহণ করলেন। সঙ্গে রইলো ভাই গদাধর।

গদাধর কখনো মায়ের মন্দিরে ভাবতন্ময় হয়ে থাকেন, কখনো বা ঐ ভাবে ঘুরে বেড়ান গঙ্গাতীরে। মন্দিরের মা ভবতারিণীর কেমন অমোঘ আকর্ষণ! গদাধর দেবীর বেশকারীর কাজ নিলেন। বিভোর হয়ে ঘুরতে লাগলেন মায়ের আশেপাশে। এর পর মন্দিরের পূজারীর পদ গ্রহণ সূচনা করে তাঁর জীবনের নূতন অধ্যায়। পুরোহিত গদাধর ভবতারিণী বিগ্রহের সঙ্গে ছোট ছেলের মত কথা বলে, মুখের কাছে খাবার নিয়ে পীড়াপীড়ি করে, নানা আবদার জানায় মায়ের কাছে। ভক্ত সাধক আর জগন্মাতার মধ্যে গড়ে ওঠে এক অচ্ছেদ্য বন্ধন।

লোক বললে শক্তি দীক্ষা না দিলে দেবীপূজা করা যায় না। তন্ত্রাচার্য কেনারাম ভট্টাচার্যকে গদাধরের পছন্দ। তাঁর কাছেই দীক্ষা নিলেন। এই দীক্ষার পরই ঘটলো এক অদ্ভুত কাণ্ড। ভাবাবেশে মূর্ছিত হলেন গদাধর।

ভবতারিণীর পূজায় দেহ-মন-প্রাণ ঢেলে দিলেন তিনি, ভক্তির জোয়ার এসে ছাপিয়ে দিল তাঁর জীবনের দুই কূল। মন্দিরে বসে মাকে শোনান রামপ্রসাদ আর কমলাকান্তের গান, আবার রাত্রে মন্দির বন্ধ হলে পঞ্চবটীর সংলগ্ন বনে ধ্যানে বসেন ঠাকুর। কোন সাধন কৃচ্ছ্রেই তিনি পরাঙ্মুখ নন। হাতে টাকা আর মাটি নিয়ে 'মাটি-টাকা টাকা-মাটি' বলে বারবার ছুঁড়ে ফেলে দেন গঙ্গার বুকে। সাধন-জীবনের মূল কথা,

অহংভাব নাশ করতে হবে। আনতে হবে সর্বজীবে শিবজ্ঞান। ঠাকুর তাই কালীবাড়ির কাঙালীদের উচ্ছিষ্ট ভোজনে বসে যান। এই কাঙালীরাই যে তাঁর ইষ্টদেবীর রূপ। 'মা মা' করে ঠাকুর পাগল হলেন। একদিন তিনি হৃদয়ের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে মন্দিরে ঢুকলেন, মায়ের হাতের খড়্গ দিয়ে নিজের জীবন নাশ করতে। জ্যোতির্ময়ী রূপে মা এসে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে। রামকৃষ্ণ সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। এই দিব্যদর্শনের পর আরও এক পরিবর্তন এলো তাঁর জীবনে। মাগো! আমায় কৃপা কর্, দেখা দে! এই বলে ডাকেন রামকৃষ্ণ। মা-ও সাড়া দেন। ওরে, তুই এটা কর্, ওটা করিস্‌নে, এই বলে নির্দেশ দেন মা।

অন্নব্যঞ্জনের থালা নিজের হাতে মায়ের মুখে তুলে ধরেন ঠাকুর। তখনই আবার তাঁকে বলতে শোনা যায়, কি বলছিস্ মা! আমি খাবো? আচ্ছা আচ্ছা, এই আমি খাচ্ছি! এই বলে নিজে খেয়ে উচ্ছিষ্ট অংশ তুলে ধরেন মায়ের মুখের কাছে।

এই নিয়ে নালিশ গেল কর্তৃপক্ষের কাছে। রাণী রাসমণির জামাতা মথুরবাবু ছুটে এলেন তদন্তে। বুঝতে বাকি রইল না, এ হলো সত্যিকার প্রেমভক্তি। তাঁরা আদেশ দিয়ে গেলেন, এ হেন লোকের কাজে ও চলা-ফেরায় কেউ যেন কোন বাধা না দেয়।

একদিন রাণী রাসমণি মন্দিরে বসে ঠাকুরের প্রাণ-গলানো গান শুনতে বসলেন। ঠাকুর পরমানন্দে শুরু করলেন মাতৃসঙ্গীত। রাণী কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই অন্যমনা হয়ে একটা জটিল মামলার কথা চিন্তা করছিলেন। অন্তর্যামী ঠাকুর কিন্তু ধরে ফেললেন। রাণীমায়ের গালে ঠাস্ করে এক চড় কষিয়ে দিয়ে বললেন, এখানেও ওসব চিন্তা?

দেখতে দেখতে ঠাকুরের দিব্যোন্মাদের ভাব খুব বেড়ে যায়। বায়ু ঊর্ধ্বগতি, মাথার চুল রুক্ষ, চোখ রক্তবর্ণ, পরনের কাপড় বিস্রস্ত। দেশে মায়ের কাছে খবর পৌঁছলো। মা চন্দ্রমণি উৎকণ্ঠিতা হলেন। ছেলেকে নিয়ে এলেন কামারপুকুর, নিজের কাছে। ধীরে ধীরে তাঁর পরিবর্তন

দেখা যেতে লাগলো। মায়ের ইচ্ছা হলো ছেলের বিয়ে দেবেন। মেয়ে খোঁজা হতে লাগলো। একদিন গদাধর নিজেই মাকে ডেকে বললেন, হেথায়-হোথায় খুঁজলে কি হবে? জয়রামবাটীর রাম মুখুজ্যের বাড়িতে খুঁজে দেখো গে। বিয়ের কনে কুটোবাঁধা হয়ে আছে।

সত্যই, কনের সন্ধান সেখানে মিললো। সারদামণিকে মা সানন্দে বরণ করে তুললেন ঘরে।

এরপর রামকৃষ্ণ কলকাতায় ফিরলেন। কিছুদিনের মধ্যেই আবার সেই পাগল-দশা। সেই দিব্যোন্মাদনা।

১৮৬১ সালের শেষভাগে গঙ্গাতীরে বকুলতলার ঘাটে একদিন একটা নৌকো এসে ভিড়লো। বেরিয়ে এলো এক ভৈরবী। রামকৃষ্ণ তাঁকে দেখে ব্যাকুল হলেন। ভাগ্নে হৃদয়কে বললেন, ওরে শীগগির যা না, ওঁকে এখানে ডেকে আন্। আমার নাম করে তুই বল্‌গে। উনি ঠিক আসবেন।

সত্যি তাই হলো, উনি তৎক্ষণাৎ এলেন: তুমি এখানে রয়েছো? তোমায় যে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি।

তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধা ভৈরবী যোগেশ্বরী রামকৃষ্ণকে তন্ত্র-সাধনায় এগিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয়। তিনি সকলকে বলে গেলেন, রামকৃষ্ণ অবতার। এবার নিতাইয়ের খোলে চৈতন্যের অবতরণ।

এরপরই সৌভাগ্যক্রমে গদাধর গুরুরূপে পেলেন বিখ্যাত বেদান্ত তোতাপুরীকে। বিরজা হোম সমাপ্তির পর তাঁর সন্ন্যাস নাম হলো, শ্রীরামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণের সাধনাকে তোতাপুরী পূর্ণাঙ্গ করে গেলেন। অখ্যাত অজ্ঞাত পুরোহিত প্রবিষ্ট হলেন যুগাচার্যের ভূমিকায়।

ওদিকে ঠাকুরের স্ত্রী সারদামণি ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করলেন। স্বামীর সেবার জন্য তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠলো, বাবাকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হলেন তিনি। ঠাকুর খুব স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করলেন তাঁকে। দুদিন পর জিগ্যেস করলেন, কিগো, আমায় কি তুমি মায়ায় বদ্ধ করতে এসেছো?

সারদামণি শান্তকণ্ঠে বললেন, না, তা কেন? আমি তোমার সহধর্মিণী। তোমার ধর্মপথে সহায়তা করতেই আমি এসেছি।

সারদামণি সত্য সত্যই ধর্মপথে সহায়তা করেছিলেন এবং রামকৃষ্ণদেব তাকে মহামায়া জ্ঞানে পূজাও করেছিলেন। নিজের পত্নীতেও ঠাকুরের এই মাতৃভাব ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ। এসময় ঠাকুরের জীবন-লীলানাট্যে এক নতুন দৃশ্যপট উন্মোচিত হয়। এবার তিনি আত্মসমাহিত সাধক নন, লোকগুরু।

মনীষী বাগ্মী ও ধর্মনেতারূপে কেশব সেনের তখন বিরাট প্রতিষ্ঠা। তাঁর সঙ্গে ঠাকুরের প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠলো। কেশব সেনের দেখাদেখি বিজয়কৃষ্ণ, প্রতাপ মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতিও আসতে থাকেন।

একদিন কেশব সেন সখেদে রামকৃষ্ণকে বললেন : মশাই! বলে দিন, কেন আমার ঈশ্বর দর্শন হচ্ছে না!

উত্তরে রামকৃষ্ণ সোজাসুজি বলে দিলেন, লোকমান্য, বিদ্যা, এসব নিয়ে তুমি আছো কি না, তাই হয় না। ছেলে চুষি নিয়ে যতক্ষণ চোষে ততক্ষণ মা আসে না। লাল চুষি। খানিকক্ষণ পরে চুষি ফেলে দিয়ে যখন চীৎকার করে ছেলে, তখন ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে মা ছুটে আসে।

দক্ষিণেশ্বরের এই পাগলা বামুনের ভগবৎ-কথা শোনবার জন্য দলে দলে লোকে ভিড় করে। কলকাতার শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এদিকে। কিন্তু বিষয়ী ও অর্ধ বিষয়ী লোকের ভিড়ে রামকৃষ্ণের হাঁপ ধরে। কই, যে শুদ্ধসত্ত্ব বৈরাগ্যবান সাধকদের প্রতীক্ষায় তিনি আছেন, তারা কোথায়? জগজ্জননী যে নিজে বলেছেন, তারা আসবে। সে-কথা ত মিথ্যা নয়।

দিন আসে, দিন যায়। রামকৃষ্ণ কুঠিবাড়ির ছাদে গিয়ে একদিন ডাক ছেড়ে কাঁদতে থাকেন, 'ওরে, তোরা সব কে কোথায় আছিস,

আয়। তোদের না দেখে যে আমি আর একদিনও থাকতে পারছিনে।'

এসে যায় মিলনের লগ্ন। একের পর এক আসে শুদ্ধাত্মা, মুমুক্ষু ভক্তের দল। রামকৃষ্ণের আদর্শের এরাই ধারক বাহক। নব ধর্মান্দোলনের এক একটি স্তম্ভ। নরেন তাদের অন্যতম। দেশের সমাজ-জীবনে তখন চলেছে এক নিদারুণ মানস সঙ্কট। নরেন যেন সেই মানস-সঙ্কটের প্রতীক। একদিকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আদর্শ সংঘাত, আর একদিকে জাতির আত্মপরিচয়, সাধন ও আত্ম প্রতিষ্ঠার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। কোথায় আলো? কোথায় পথ? নরেন, তারক, রাখাল প্রভৃতি এইসব প্রশ্ন নিয়ে এসে দাঁড়ালেন রামকৃষ্ণের সামনে। রামকৃষ্ণ দিলেন সত্যের সন্ধান। কিন্তু কি সহজ, পরিহাস-উচ্ছল ভঙ্গী তাঁর শিক্ষা দেওয়ার। হাসি ঠাট্টা তামাশার মধ্যে তাদের গড়ে তোলেন। ঠাকুর বললেন, ত্যাখো, আমি এ ছোকরাদের কেবল নিরামিষ দিই না। মাঝে মাঝে আঁষ ধোয়া জল একটু একটু করে দিই। তা না হলে এরা আসবে কেন?

নিষ্ঠা ও কঠোর সাধন-ভজনের ফলে রাখাল মহারাজের মধ্যে কিছু কিছু অলৌকিক বিভূতি স্ফুরিত হয়েছিল। এবং মাঝে মাঝে এইসব দেখার জন্য তার মনে প্রবল ইচ্ছা জেগেছিল। একদিন তাঁকে ডেকে ঠাকুর তীব্র ভাষায় বললেন: ওরে, তোর এমন হীন বুদ্ধি কেন রে? কোথায় শুদ্ধাভক্তি নিয়ে সাধন-ভজনে থাকবি, তা না, অষ্ট-সিদ্ধির দিকে মন দিচ্ছিস? প্রিয় শিষ্য নরেনকেও তিনি একদিন এইরকম ধমক দিয়েছিলেন। কঠোরতপা নরেনকে একদিন ডেকে বললেন, আচ্ছা ঠিক করে বল দেখি—তুই কি চাস্। উত্তর হলো, আমার ইচ্ছা হয় শুকদেবের মত পাঁচ-ছ'দিন সমাধিতে ডুবে থাকি। তারপর শুধু শরীর রক্ষার জন্য নীচে নেমে এসে আবার সমাধিতে চলে যাই।

রামকৃষ্ণ বললেন, ছি ছি, তুই এত বড় আধার। তোর মুখে এই

কথা ? আমি ভেবেছিলাম তুই বটগাছের মত হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা নিজে মুক্তি চাস ? না না, অত ছোট নজর করিস্‌নি। এইভাবে তিনি তরুণ সাধকদের গড়ে তোলেন। তাঁরা যখন তাদের সমস্যার কথা, অভিজ্ঞতার কথা অকপটে জানিয়ে নির্দেশ চাইতো, ঠাকুর তাদের অন্তরঙ্গ সখা সুহৃদ হয়ে যেতেন। সাধ্য ও সাধন সম্পর্কে ফাঁকা আওয়াজ নয়, উঁচুতে বসে নাগালের বাইরে থেকে উপদেশ বর্ষণ করে কর্তব্য সমাধা করা নয়। ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে একান্ত অন্তরঙ্গতায় আশ্রিতের হাত ধরেন ঠাকুর, তারপর ধীরে ধীরে তাদের টেনে নেন পরম প্রাপ্তির দিকে। অতীন্দ্রিয় রাজ্যের চাবি-কাঠিটি তাঁর হাতে। শুধু কথায় ও স্পর্শে তাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত করেন, শিষ্যদের জীবনে আসে নব নব অধ্যাত্ম অনুভূতি। শুধু দৃষ্টি সম্পাতে ও পদাঙ্গুষ্ঠের ছোঁয়ায় ঘটে শিষ্যদের নবজন্ম। ঠিক এইরকম ঘটিয়েছিলেন ঠাকুর অসামান্য প্রতিভাধর নাট্যকার ও নট গিরিশ ঘোষের জীবনে। মনীষা ব্যক্তিত্ব ও ক্ষুরধার বুদ্ধির দিক দিয়ে তিনি অতুলনীয়, কখনো কারুর কাছে মাথা নোয়ান নি। কিন্তু ঘোর মাতাল ও দুরন্ত তিনি। এই গিরিশ দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের সামনে মাতলামি করেছেন, গালিগালাজ করেছেন। ঠাকুর কিন্তু করুণার মূর্ত বিগ্রহ। অসামান্য ধৈর্য নিয়ে তিনি এই দুর্দান্ত ভক্তের পরিবর্তনের প্রতীক্ষা করেছেন, তাঁর নটবৃত্তি ও মদ্যপানে বাধা দেননি। বরং কেউ নালিশ করলে বলেছেন— খাক্ না, শালা ক'দিন আর খাবে ! গিরিশের কাছে এইটাই হলো ঠাকুরের ভগবত্তার প্রমাণ। তিনি ঠাকুরের চরণে আত্মসমর্পণ করলেন।

নরেনের মধ্যে তিনি একটা আলাদা শক্তি দেখেছিলেন। এই নরেনের জন্যই যেন পথ চেয়ে বসেছিলেন। প্রথম যেদিন নরেন তাঁর সঙ্গে দেখা করেন, ঠাকুর ছেলেমানুষের মত তাকে বলেছিলেন : এতদিন কোথায় ছিলি ? এতো দেরি করতে হয় ! আমি যে তোর পথ চেয়ে বসে আছি। উদ্ধত পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবান্বিত যুবক নরেন ঠাকুরকে

কত কূট কথা বলে বাজিয়ে বাজিয়ে দেখেছে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর জাদু-স্পর্শে ঘটে গেছে তার রূপান্তর। সংসারের আর্থিক সমস্যাক্লিষ্ট নরেনকে ঠাকুর বললেন—যা, মন্দিরে মায়ের কাছে গিয়ে বল্ তোর অভাবের কথা। মা তোর সব কষ্ট দূর করে দেবেন! সেই নরেন কিন্তু গিয়ে মায়ের কাছে পড়ে চাইলো শুদ্ধাভক্তি, টাকা নয়, পয়সা নয়, অভাব-মোচনের আশীর্বাদ নয়—শুধু শুদ্ধাভক্তি।

ঠাকুর বললেন, নরেন খাপ-খোলা তলোয়ার। কেশবের মধ্যে একটা শক্তি আছে যার ফলে সে জগৎ-বিখ্যাত হয়েছে। আর, নরেনের ভেতর রয়েছে আঠারো শক্তি ও জ্ঞানখড়্গ সহায়ে মায়াময় সব সন্ধনকে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলেছে!

ঠাকুরের এই অন্তর্দৃষ্টি যে কতো নির্ভুল, ইতিহাস তা দেখেছে স্বামী বিবেকানন্দের কর্মে।

১৮৮৫ সাল। রামকৃষ্ণের লীলাময় জীবনদীপ এবার নির্বাণোন্মুখ হয়ে ওঠে। মারাত্মক ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হন তিনি। প্রথমে কলকাতায় কিছুদিন ঠাকুরের চিকিৎসা করানো হয়। তারপর তাঁকে আনা হয় কাশীপুরে। আসন্ন গুরুবিচ্ছেদের শোকচ্ছায়ায় ভক্তদের মধ্যে এইসময় গড়ে এক অচ্ছেদ্য প্রাণের বন্ধন। উত্তরকালের রামকৃষ্ণমণ্ডলীর সূচনা হয় সেদিনকার এই যোগসূত্রে। কাশীপুর উদ্যানে থাকাকালীন ঠাকুর একদিন কল্পতরু হয়ে ভক্তরা যে যা চেয়েছিল তাই দিয়েছিলেন। প্রতি বৎসর পয়লা জানুয়ারী এই কল্পতরু উৎসব পালিত হয়। এই সময় ঠাকুর কথাচ্ছলে অনেক জটিল দার্শনিক প্রশ্নের মীমাংসা করেন অবলীলায়।

একদিন এক ভক্ত প্রশ্ন করলেন: আচ্ছা ঠাকুর, ভগবান সাকার না নিরাকার?

ঠাকুর বললেন: ওরে, তিনি সাকারও বটে, নিরাকারও ঘটে। সাকার কেমন জানিস্? যেমন জল আর বরফ। জল জমেই বরফ হয়, আবার সেই বরফের ভেতর বাইরে জল। বরফ জল ছাড়া আর

কিছু নয়। কিন্তু ছাখ্, জলের রূপ নেই—অর্থাৎ তার একটা বিশেষ আকার নেই!

একদিন ঠাকুর বসে আছেন। প্রসঙ্গক্রমে 'সর্বজীবে দয়া' কথাটা তাঁর কানে এলো। অমনি সমাধিস্থ হলেন তিনি। তারপর যখন বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলো, বললেন, 'জীবে দয়া? দূর শালা। কীটানুকীট তুই? জীবকে আবার দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না না—জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা?

ঠাকুরের এই কথা শুনে নরেন্দ্রনাথ অভিভূত হয়ে যান।

ঈশ্বরদর্শন যে সম্ভব এ-কথা এমন স্পষ্টভাবে আর দৃঢ়ভাবে এর আগে কেউ বলেনি নরেন্দ্রনাথকে। বলিস্ কিরে? ঈশ্বর দেখিনি? ঠিক তোকে যেমন দেখছি তেমনি তাঁকেও দেখেছি। তোকেও আমি দেখাতে পারি। কিন্তু তার জন্যে চাই তপস্যা?

দক্ষিণেশ্বরের নিভৃতে বসে শ্রীরামকৃষ্ণ তার বিস্ময়কর প্রভাবে আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির মূল স্রোতের মোড় ঘুরিয়ে দেন। তাঁর প্রভাবে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় ভারত ঐতিহ্যের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর মূল কথা ছিল বেদান্ত। বৈরাগ্যের উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কামিনী কাঞ্চন থেকে দূরে না থাকলে সাধনমার্গে সফলতা নেই একথা তিনি বারবার বলতেন এবং নিজের জীবনে আচরণ করতেন স্বীয় স্ত্রী সারদামণিকে দেবী কালীর অংশ রূপে পূজা করে। 'আমার বিয়ের পর মা কালীর কাছে প্রার্থনা করেছিলাম,—মা! আমার স্ত্রীর মন থেকে সব রকম দেহভোগ কামনা সমূলে দূর করে দিস্। মা আমার কথা শুনেছিলেন।' —বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ! সাধনের জগতে এমন দৃষ্টান্ত আর নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, সব ধর্মই এক। যত মত তত পথ। কি হিন্দুধর্ম, কি ইসলামধর্ম, কি খ্রীষ্টধর্ম সকলেরই উদ্দেশ্য সেই এক। ভিন্ন মত ও পথ ধরে বিশ্বব্যাপী ঈশ্বরকে পাওয়া। তাঁর এই উদার আদর্শ সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছিল।

মনুষ্যদেহধারী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ইহলোক ত্যাগ করেন ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট।

স্বামী বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দের পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত। মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী। ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারী। পৌষসংক্রান্তির মকরসপ্তমী। এই পুণ্যলগ্নে ভুবনেশ্বরী দেবী এই ভুবনবিজয়ী পুত্র প্রসব করেন। একদিন ভুবনেশ্বরী শিবপূজা শেষে স্বপ্ন দেখেছিলেন, স্বয়ং মহাদেব তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। কিছু পরে ক্ষুদ্র শিশুমূর্তি ধারণ করে মহাদেব ভুবনেশ্বরীর কোলে আশ্রয় নিলেন। দিব্যানন্দে ভুবনেশ্বরী "হে শিব, হে শঙ্কর, হে করুণাময়" বলে বারবার প্রণাম করতে লাগলেন।

শিবাংশেই এ-বালকের জন্ম, তাই তার নামকরণ হলো বীরেশ্বর। এই নামই সংক্ষেপে 'বিলে' হয়ে যায়। অন্নপ্রাশনের সময় দেওয়া হয় দ্বিতীয় নাম, নরেন্দ্রনাথ।

কলিকাতার সিমুলিয়া পল্লীর দত্ত পরিবারের ঐশ্বর্য ও খ্যাতি দুই-ই ছিল। নরেন্দ্রনাথের ঠাকুর্দা দুর্গাচরণ কিন্তু মাত্র পঁচিশ বছর বয়সেই সমস্ত ঐশ্বর্য ও প্রতিষ্ঠা-লোভ ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যান। পিতা বিশ্বনাথ বংশের আইন-ব্যবসায়ে লিপ্ত থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তাঁর প্রবল পাঠানুরাগ ছিল ; নানা বিষয়ে পড়াশুনা করার ফলে গোঁড়া হিঁদুয়ানী বিসর্জন দিয়েছিলেন। অর্থোপার্জন করা ও জীবনটাকে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন নিয়ে ভোগ করার একটা সাধারণ আদর্শে তিনি চলতেন।

বালক বীরেশ্বর বড় ডানপিটে দুরন্ত ছিলেন। তাঁর দুষ্টুমিতে বিরক্ত হয়ে ভুবনেশ্বরী বলতেন, মহাদেব নিজে না এসে কোত্থেকে একটা ভূতকে পাঠিয়েছেন। দিদিরা মারধোর করতে গেলে নর্দমার কাদা গায়ে মেখে বীরেশ্বর হাততালি দিয়ে নেচে নেচে বলতেন, এবার ধর দেখি আমায় ? এই দুরন্ত দুর্দান্ত ছেলেই আবার রামায়ণ মহাভারত পাঠ-সভায় শান্তশিষ্টভাবে বসে থাকতেন। দুই মহান গ্রন্থের উপাখ্যান-

সমূহ বালকের মনে গভীর রেখাপাত করতো। হনুমানের অলৌকিক কার্যাবলী মুগ্ধ করেছিল তাঁকে। এক কথক ঠাকুর বলেছিলেন, হনুমান অমর, আজও বেঁচে আছেন! হনুমান কলা খেতে ভালোবাসেন। সরল বালক সেই বীর হনুমানের দর্শনের আশায় একদিন সত্য সত্য বাড়ির পাশের কলাবাগানে বহুক্ষণ প্রতীক্ষায় কাটালেন। শেষকালে দেখা না পেয়ে মায়ের কাছে কেঁদে সব বলে ফেললেন।

ছোটবেলা থেকেই বীরেশ্বরের এক প্রিয় খেলা ছিল, পূজায় বসা, ধ্যানে বসা। বাড়ির ছাদে প্রথমে রাম-সীতার মূর্তি, পরে শিবের মূর্তি বসিয়ে ধ্যানে ডুবে যেতেন! একদিন সন্ধ্যায় সমবয়সীদের নিয়ে গায়ে ছাই মেখে খেলার ছলে ধ্যানে বসেছেন বীরেশ্বর। এই সময় দলের একজন চোখ মেলে দেখে সামনে এক প্রকাণ্ড সাপ। 'সাপ' 'সাপ' বলে চীৎকার করে যে-যার পালালো। বীরেশ্বর কিন্তু অনড়, একেবারে বাহ্যজ্ঞানহীন। মা-বাবা সকলে ছুটে এসে দেখেন এক বিষধর সাপ ফণা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ পর সাপ ফণা গুটিয়ে চলে গেল। বীরেশ্বর তখনও ধ্যানমগ্ন। এ এক অদ্ভুত ঘটনা। সামান্য বালকের মধ্যে এমন সংযতমনা যোগীসাধকের একাগ্রতা কিভাবে এলো, এই প্রশ্ন মনে জাগে।

বিশ্বনাথ দত্তের অনেক মুসলমান মক্কেল ছিলেন। তৎকালীন রীতি অনুযায়ী বৈঠকখানার একপাশে অনেকগুলো হুঁকো ছিল। বিভিন্ন জাতের মক্কেলের জন্য বিভিন্ন হুঁকো। একদিন বীরেশ্বর ঢুকে একে একে প্রত্যেক হুঁকোয় টান দিতে লাগলেন। এমন সময় হঠাৎ বিশ্বনাথবাবু ঘরে ঢুকে, ছেলের কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক। 'কি করছিস্ রে, বিলে?' প্রশ্ন করলেন তিনি। 'যদি জাতিভেদ আমি না মানি, তাহলে আমার কি হবে তাই পরীক্ষা করছিলাম, বাবা!' উত্তর দিলেন বীরেশ্বর। এমন সংস্কারমুক্ত সন্ন্যাসীর কথা ছোট্ট বালকের মুখে শুনে বিশ্বনাথবাবু অবাক হলেন।

প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে নরেন্দ্রনাথ মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউসানে ভর্তি হন। স্কুলে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কুস্তি, বক্সিং, ক্রিকেট খেলা, প্রভৃতি বিষয়ে তিনি যেমন অগ্রণী ছিলেন,ছাত্র হিসাবেও তেমনি ছিল তাঁর সুনাম। প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলেজে যোগদান করেন। জেনারেল এসেম্বলী কলেজের অধ্যক্ষ উইলিন হেস্টি তাঁর এই ছাত্র সম্পর্কে বলেছিলেন: He is an excellent philosophical student. In all the German and English Universities there is not one student so brilliant as he is.

১৮৮০ সালের নভেম্বর মাসে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় সিমুলিয়ার সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে। ঠাকুরকে, নরেন্দ্রনাথ গান শুনিয়েছিলেন:

মন চল নিজ নিকেতনে
সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে।

নরেনের কণ্ঠস্বর ছিল বড়ই সুমিষ্ট, স্বর্গের মধু যেন ঝরে পড়ে। কি উদাত্ত ভাবগম্ভীর সংগীত! শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাবেশ এসে গেল। দু'চোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু গড়াতে লাগলো। ঠাকুর নরেনকে বললেন, একদিন এসো না, দক্ষিণেশ্বরে! কথা দিলেন নরেন্দ্রনাথ।

কিছুদিনের জন্য ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা তাঁর মন থেকে মুছে গিয়েছিল। ওদিকে বিয়ের কথাবার্তাও মাঝে মাঝে বলছেন বাবা-মা। অথচ বিবাহে নরেনের ভীষণ বিতৃষ্ণা। একদিন হঠাৎ বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে নিয়ে নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

—আয়, তুই এতদিন আমায় কেমন করে ভুলে ছিলি! তুই আসবি বলে আমি কতদিন ধরে পথপানে চেয়ে আছি। বিষয়ী লোকের সঙ্গে কথা কয়ে কয়ে আমার মুখ পুড়ে গেছে, আজ থেকে তোর মত যথার্থ ত্যাগীর সঙ্গে কথা কয়ে শান্তি পাব। কথাগুলো

বলতে বলতে দু'চোখ জলে ভেসে গেলো ঠাকুরের। শুধু তাই নয়! পরমহংসদেব কৃতাঞ্জলি হয়ে সসম্ভ্রমে নরেনকে উদ্দেশ করে বলতে লাগলেন—আমি জানি, তুমি নররূপী নারায়ণ, জীবের কল্যাণ-কামনায় দেহ ধারণ করেছো!

নরেন তো অবাক। এসব কি কথা! লোকটা উন্মাদ?

আরও একদিনের কথা। ঠাকুর ভক্তদের সম্বোধন করে বললেন, ভাবে দেখলাম, কেশব যে শক্তিবলে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে, নরেনের মধ্যে অমন আঠারোটা শক্তি রয়েছে। কেশব ও বিজয়ের মধ্যে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলছে। ওর মধ্যে জ্ঞানসূর্য রয়েছে।

দৃঢ়চেতা নরেন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবসুলভ দৃঢ়তার সঙ্গে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে উঠলেন। শুধু তাই নয়। যুক্তিবাদী পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নরেন্দ্রনাথ বারবার নানাভাবে এই মানুষটিকে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন, যাচাই করে নিতে লাগলেন। সত্যলাভের প্রেরণা নিয়ে তিনি ইতিমধ্যেই ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত আরম্ভ করেছিলেন। 'যুক্তিপন্থী সন্দেহবাদী অথচ সত্যকাম' নরেন সভ্য হয়েছেন ব্রাহ্ম-সমাজের কিন্তু সেখানেও তাঁর আধ্যাত্মিক পিপাসা তৃপ্ত হচ্ছে না। সকলের কাছেই তাঁর সোজা প্রশ্ন: মহাশয়! আপনি কি নিজে ঈশ্বর দর্শন করেছেন? কেউই তাঁর এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছেন না।

একদিন সেই একই প্রশ্ন ঠাকুর রামকৃষ্ণকে করে বসলেন নরেন্দ্র-নাথ। এ প্রশ্নের উত্তর তাঁর চাই-ই। কিছুমাত্র ইতস্তত না করে ঠাকুর উত্তর দিলেন, নিশ্চয়। তোকে যেমন প্রত্যক্ষ দেখছি, তার চেয়েও স্পষ্ট দেখেছি। তুই দেখতে চাস্? তোকেও দেখাতে পারি।

শুধু তাই নয়। এর কিছুদিন পর এক সন্ধ্যায় ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সহসা আসন থেকে উঠে নিজের দক্ষিণ চরণ তাঁর স্কন্ধে স্থাপন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে নরেনের ভাবান্তর ঘটে গেলো। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি যেন তাঁর সামনে সবেগে ঘুরতে লাগলো, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের হৃদস্পন্দন যেন অনুভব করতে লাগলেন নরেন্দ্রনাথ।

ভয়ে বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠলেন তিনি, ওগো ! তুমি আমার একি করলে। আমার যে বাপ-মা আছেন !

ঠাকুর এইবার তাঁর বুকে হাত রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলো।

বি. এ. পরীক্ষা হয়ে গেলো। কিন্তু শীঘ্রই আর এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হলো নরেন্দ্রনাথকে। অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে প্রাণত্যাগ করলেন বিশ্বনাথ। চারিদিকে অন্ধকার দেখলেন নরেন্দ্রনাথ। উদারচেতা, আত্মীয়-বন্ধুবৎসল বাবা তেমন কিছু রেখে গেলেন না। তার উপর আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে বিষয় সম্পত্তি নিয়ে লেগে গেলো বিবাদ বিসম্বাদ ও মামলা। বড়ো ছেলে হওয়ায় কঠিন দায়িত্বে পড়লেন তিনি। দ্বারে দ্বারে ঘুরেও চাকরি জোটে না, সে এক কঠিন অবস্থা।

ভরসাস্থল রামকৃষ্ণ, তাঁকে গিয়ে ধরলেন নরেন। বললেন, আমার মা ভাই বোনেদের দুটো খাওয়ার যাতে উপায় হয় সে সম্বন্ধে অনুরোধ করুন না আপনার মাকে।

ঠাকুর বললেন, আচ্ছা, আজ মঙ্গলবার, আমি বলছি আজ রাত্রে কালী-ঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম করে মায়ের কাছে তুই যা চাইবি, মা তোকে তাই দেবেন।

রাত্রি এক প্রহর হলো। সংশয় দ্বন্দ্ব নিয়ে এগোলেন নরেন, প্রবেশ করলেন কালী-ঘরে। জগদম্বার রূপে শ্রীমন্দির আলোকিত। তারপর কি যে ঘটে গেলো তা তিনিই জানেন আর জানেন পরমহংসদেব। পার্থিব কিছু চাওয়া হলো না। নরেন চেয়ে বসলেন : মা ! বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি দাও ! যেন তোমায় সর্বদা দেখতে পাই, মা !

—কি রে, কি চাইলি ? জিজ্ঞেস করলেন ঠাকুর।

বারবার তিনবার ঠাকুর নরেনকে মায়ের কাছে পাঠালেন, কিন্তু নরেন কোনবারই মুখ ফুটে মায়ের কাছে সংসারের স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করতে পারলেন না। পারবেন কি করে ? আসলে যে তাঁর মধ্যে ছিলো আজন্ম বৈরাগ্যপ্রবণ মন।

—যা, তুই যখন চাইতে পারলি না, তখন তোর অদৃষ্টে সংসার-সুখ নেই। তবে আমি বলছি, মোটা ভাত-কাপড়ের দুঃখ তোদের হবে না!

সত্যই তাই হলো। নরেন্দ্রনাথ এটর্নি অফিসে কাজ করে এবং কয়েকখানি বইয়ের অনুবাদ করে কিছু উপার্জন করলেন। পরে স্থায়ীভাবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা ও তাঁর সংস্পর্শে আসাই নরেন্দ্রনাথের জীবনের সবচেয়ে বড়ো, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন নিজেই বলেছিলেন, আরে—ওর জন্যেই তো এবার এখানে আসা! অর্থাৎ নরেনকে বিবেকানন্দ করে তুলে জগতের কল্যাণ করবার জন্যই যেন তাঁর জন্মগ্রহণ। ঠাকুরের সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা, সাকার বা নিরাকার যে-কোনো ভাবে ভগবানকে খোঁজার কথা, জীবসেবার নির্দেশ নরেন্দ্রনাথের জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। একবার নির্বিকল্প সমাধিলাভের উপায় জানতে চেয়েছিলেন তিনি। ঠাকুর তিরস্কার করে বলেছিলেন, ছি-ছি! তুইও শেষে সহজ রাস্তাটা খুঁজে বার করে বাজীমাৎ করতে চাস্। জগৎসংসারের ভালো-মন্দর দিকে না তাকিয়ে তুইও যোগী সাজতে চাস্? আমার কতো ইচ্ছে, তুই বটগাছের মতো হবি, কতো মানুষের দুঃখ ঘোচাবি, আশ্রয় দিবি কতো মানুষকে। তা নয়, কেবল নিজের মুক্তির কথা ভাবছিস্!

ঠাকুরের এই কথাই নরেন্দ্রনাথের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিলে। তার উপর জীবসেবার নির্দেশ। নির্বিকল্প সমাধির কথা ছেড়ে কর্মযোগী বিবেকানন্দ জীবকে শিবজ্ঞানে স্বদেশ, স্বজাতি, এমনকি বিশ্বমানবের কল্যাণ সাধনে করেন তাঁর জীবন উৎসর্গ।

১৮৮৬ সাল। ১৫ই আগস্ট, ঠাকুর দেহ রাখলেন। কাশীপুরের বাগানবাটীতে যে ক'জন তরুণ শিষ্য ঠাকুরকে ঘিরে ভবিষ্যৎ সাধক জীবনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তাঁদের জীবনে নেমে এলো কঠিন

সমস্যা। অতঃপর? সমস্ত গুরুদায়িত্ব নরেন্দ্রনাথের উপর, নিজেকে এবং আর বারোজন সতীর্থকে যথোচিত পথে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব তাঁর। এই সময় যথার্থ নেতৃত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি। ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শে অনুপ্রাণিত একদল সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গঠন করলেন নরেন্দ্রনাথ। পরবর্তীকালে এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায় পৃথিবীময় মানুষের কলাণে ব্রতী হন।

১৮৮৮ সাল থেকে ১৮৯২ সাল পর্যন্ত একটানা চার বছর বিবেকানন্দ তীর্থভ্রমণে রত ছিলেন। এখন তিনি পরিব্রাজক। কাশী, অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, বৃন্দাবন, বিহার ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পল্লীনগর, জয়রামবাটী, বৈদ্যনাথধাম, প্রয়াগধাম, গাজিপুর, হৃষীকেশ রাজপুতানা, দক্ষিণ ভারত প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করলেন। শেষে দক্ষিণবিন্দু কন্যাকুমারীর প্রস্তরবেদীতে যোগাসনে বসে বিবেকানন্দ ভাবলেন, ধনী নির্ধন, উচ্চ, নীচ পণ্ডিত, রাজা, মহারাজা প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে ফিরলাম, পরিব্রাজক ব্রত উদ্‌যাপিত হলো, ভারতবর্ষকে দেখলাম—এখন আমি কি করবো? কি কর্ম অবশিষ্ট আছে? সঙ্গে সঙ্গে ভারতের আসল রূপ তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠলো। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, শিক্ষা নেই, দীক্ষা নেই, পুরোহিত সম্প্রদায়ের নিষ্ঠুর ব্যবহারে কোটি কোটি লোক আশা হারিয়েছে, নৈতিক বল হারিয়েছে, কুসংস্কারে দেশ গিয়েছে ছেয়ে! কপর্দকহীন সন্ন্যাসী আমি। কিন্তু তবুও আমার কি করার কিছু নেই? মনে পড়ে গেলো গুরু রামকৃষ্ণের বাণী, যত্র জীব তত্র শিব! এদের সেবাই হবে আমার কাজ। শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ! দেশের লোককে বলতে হবে, তোমরা অমৃতের পুত্র, আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে হবে তাদের মধ্যে। এ কাজের জন্য চাই মানুষ; চাই অর্থ।

অর্থের জন্য প্রয়োজন হলে "বিস্তীর্ণ এই জলধি উত্তীর্ণ হয়ে ভারতের লক্ষ লক্ষ দরিদ্রের প্রতিনিধি হয়ে পাশ্চাত্য দেশে যাবো এবং মস্তিষ্কবলে সেখানে অর্থ উপার্জন করে স্বদেশে ফিরে এসে

অবশিষ্ট জীবন মাতৃভূমির উন্নতিকল্পে ব্যয় করবো”—স্থির করলেন বিবেকানন্দ।

একবার তিনি বলেছিলেন, যখন আমি ফিরে আসবো, সমাজের উপর বোমার মতো ফেটে পড়বো এবং সমাজ আমার অনুবর্তী হবে। তাঁর ঐ কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। পরিব্রাজনের পর সত্যই তিনি অমিত তেজে আশ্চর্য উদ্দীপনায় কাজে নামলেন।

১৮৯৩ সালের ৩১শে মে সমুন্নতশির বিবেকানন্দ রওনা হলেন শিকাগো অভিমুখে। উদ্দেশ্য শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদান। স্বামীজীর শিষ্য খেতরীর মহারাজা গুরুর এই ধর্ম অভিযানে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন। বিশ্ববাসীকে বেদান্তবাণীর মাহাত্ম্য শোনানো তাঁর পূত কর্তৃব্য! অনেক কষ্ট, অনেক অপমান সহ্য করে সেই মহাসম্মেলনে যোগদান করার সুযোগ পেলেন বিবেকানন্দ। এলো সেই স্মরণীয় দিন—১৮৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর। সভামঞ্চে এসে দাঁড়ালেন গৈরিক উষ্ণীষ সন্ন্যাসী। পণ্ডিতী ভাষা নয়, প্রেমের ভাষায় সম্বোধন করলেন, আমেরিকাবাসী ভগ্নি ও ভ্রাতাগণ! বিবেকানন্দের এই হৃদ্যতাপূর্ণ সম্বোধনে সভাস্থ সকলে বিগলিত হয়ে গেলো। আনন্দ করতালিতে ফেটে পড়লো সভাকক্ষ। সংক্ষেপে স্বামীজী নিবেদন করলেন, সকল ধর্মে সমান বিশ্বাসের কথা হিন্দুধর্মের, পরমত-সহিষ্ণুতার কথা। পর পর মহাসম্মেলনের বিভিন্ন শাখায় বক্তৃতা দিলেন। সারা আমেরিকায় সাড়া পড়ে গেলো, রাতারাতি বিবেকানন্দ বিশ্বজয়ী হলেন, ভারতবর্ষ সম্মানের উচ্চশিখরে স্থান পেলো।

সমগ্র আমেরিকায় তিনি বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালেন। এ বিষয়ে এক 'বক্তৃতা কোম্পানী'র সঙ্গে তিনি চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন! অর্জিত অর্থ অবশ্য তিনি অকাতরে দান করে দিতেন। এরপর তিনি গেলেন ইউরোপে। প্যারিস থেকে গেলেন লণ্ডনে। সারা ইংলণ্ডেও সাড়া পড়ে গেলো, সমস্ত শহর ভেঙে পড়লো তাঁর চারপাশে। এখানে এক বক্তৃতাসভায় আইরিশ কুমারী মার্গারেট ই. নোবেল স্বামীজীর সঙ্গে

পরিচিতা হন। স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের ও আত্মীয়-স্বজন সকলের মায়াবন্ধন ছিন্ন করে ইনি ভারতের নারীসমাজের কল্যাণের জন্য চলে এলেন ভারতবর্ষে। তারপর তাঁর সে কি আশ্চর্য কর্মোদ্যম! আজও ভারতবাসীর কাছে তিনি 'লোকমাতা' 'ভগিনী নিবেদিতা' নামে শ্রদ্ধা পেয়ে আসছেন।

১৮৯৭ সালের গোড়ার দিকে বিবেকানন্দ ভারতে ফিরে এলেন। বিশ্ব জয় করে ফিরলেন সন্ন্যাসী। সারা দেশে সে কি উল্লাস, সে কি উদ্দীপনা। রাজা মহারাজা থেকে সাধারণ লোক পর্যন্ত যে রকম স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানিয়েছিলো তাঁকে, তা সত্যই ইতিহাসে বিরল।

এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ। স্বামীজী একবার বলেছিলেন, আমি এমন এক ধর্ম প্রচার করতে চাই যাতে মানুষ তৈরী হয়। কুসংস্কার সরিয়ে ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের ব্রত; ব্যক্তিগত মুক্তি নয়, সমষ্টিগত মুক্তির ব্রত। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত! যুগধর্ম প্রচারের জন্য সঙ্ঘবদ্ধতার প্রয়োজন বোধ করলেন স্বামীজী। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা হলো। বেলুড়মঠ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান হলো ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর। সারা ভারত তোলপাড় করে দিলেন স্বামীজী তাঁর অক্লান্ত কর্মসূচীতে। তারপর আবার বিদেশ-যাত্রা। ১৮৯৯ সালের জুন মাস থেকে ১৯০০ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ইংলণ্ড, আমেরিকা, প্যারী, ভিয়েনা, হাঙ্গেরী, সার্বিয়া, বুলগেরিয়া, ইস্তাম্বুল, এথেন্স, কায়রো প্রভৃতি দেশে ভারতবাণী প্রচার করে দেশে ফিরলেন। দীর্ঘকাল প্রবাসে কাটিয়ে ভারতবর্ষে ফিরে আবার নবীন উদ্যমে তিনি কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু শরীর তাঁর একেবারেই ভেঙে পড়লো। ধীরে ধীরে স্বামীজী নিজেই বুঝলেন, আর বেশীদিন নয়। ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই। সেদিন সকাল থেকেই তাঁর কথায় ও আচরণে স্বামীজী সকলকে বুঝিয়ে দিলেন, আজ তাঁর শেষ দিন। সন্ধ্যালগ্নে নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে সমাধিস্থ হলেন। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, বর্তমান অতীত ভবিষ্যৎ—সব

যেন একটি বিন্দুতে লীন হলো। ইচ্ছামৃত্যু বরণ করলেন বিশ্ব-জনমনজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বামীজীর আবির্ভাব ভারতের ইতিহাসের এক বিস্ময়কর ঘটনা। এমন সাধক আর দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ করেননি, যাঁর তেজ ও কর্মবিক্রমের মূল কথা ছিলো সমষ্টি মুক্তি, দরিদ্র নিপীড়িতের জন্য নিবিড় প্রেম যাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিলো সক্রিয় কর্মপন্থায়। ভারতের প্রতিটি মানুষকে তিনি যে কতো ভালোবাসতেন নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিতে তা স্পন্দিত :

"…ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, আমার দেব-দেবী, আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিন-রাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।…"

রমন মহর্ষি

অরুণাচল ! অরুণাচল !

কি ইন্দ্রজাল এই নামে ! বালক বেঙ্কটরমণের হৃদয়ে এই নাম তুলেছে এক অদ্ভুত অনুরণন। অরুণাচলের ছন্দোময় বাণী তার ঘুমন্ত জীবনে এনেছে জাগরণের আলো। সর্বত্যাগী হয়ে সে ছুটেছে তিরুভান্নামালাই।

ট্রেন থেকে নেমে বালক দেখলো সূর্যের রক্তচ্ছটায় রঞ্জিত অরুণ-গিরি, আর তার সানুদেশে অরুণাচলেশ্বরের সহস্রস্তম্ভ মন্দির। তারিখটা ১৮৯৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর। মন্দির দুয়ার খোলা। আনন্দের সীমা নেই ; সাশ্রু নয়নে প্রভুর চরণে প্রণতি জানায় বালক বেঙ্কটরমণ। আশ্রয় নেয় মন্দিরের কোণে। চিরদিনের জন্য আত্ম-সমর্পণ। উত্তরজীবনে সেদিনকার সেই ঘরছাড়া বালকই রূপান্তরিত হয় এক মহাজ্ঞানী তাপসরূপে। নাম হয় মহর্ষি রমণ।

বালক সেদিন মোড়কে সঞ্চিত হাতের খাবারটি আর পথের খরচ বাবদ মুদ্রা তিনটি জলে নিক্ষেপ করে দেয়, উপবীত দেয় ভাসিয়ে। পরনের কাপড় ছিঁড়ে তৈরী করে কৌপীন, ধারণ করে নিষ্কিঞ্চন সাধুর বেশ।

—বাবা, তুমি কি মস্তক মুণ্ডন করতে চাও ? তাহলে আমার সঙ্গে এসো।

অপরিচিত একজনের অযাচিত আহ্বানে পুলকিত হয়ে ওঠে বালক। সত্যই তো ! এই সুন্দর কোঁকড়ানো চুলের আর প্রয়োজন কি ? তৎক্ষণাৎ এগিয়ে যায় বালক।

মুণ্ডনের পর স্নান, শাস্ত্রের বিধি। কিন্তু বেঙ্কটরমণের মনে কেমন এক বৈরাগ্যভাব। কি দরকার, নশ্বর দেহের জন্য আবার স্নানের বিলাস কেন ? বালক নারাজ। কিন্তু স্বয়ং অরুণাচলেশ্বর যেন বন্দোবস্ত

করে দিলেন। পথের মধ্যে অকস্মাৎ মুষলধারে বৃষ্টি হলো। মন্দিরমণ্ডপে যখন বালক এসে দাঁড়ালো, সর্বাঙ্গ তার স্নাত। মণ্ডপের মাঝখানে অবস্থিত প্রস্তর বেদীর উপর বালক সাধক তার আসন বিছিয়ে বসলো ধ্যানে। আর কোনদিকে কোনো আকর্ষণ নেই তার। কোনো আলোড়নই কানে পৌঁছায় না তার, অপরিচিত স্থানে সহায় বা বন্ধুবান্ধব কেউ নেই। নতুন এই বালক সন্ন্যাসীর উপর নির্যাতন শুরু করে স্থানীয় দুষ্ট বালকের দল। নানা উপদ্রব করে, ঢিল ছোঁড়ে তারা। শেষাদ্রিস্বামী নামে এক সন্ন্যাসী বালকের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সেবা পরিচর্যা করেন, কিন্তু দুষ্ট বালকদের অত্যাচার থামে না। অগত্যা বেঙ্কটরমণ নিকটবর্তী পাতাল-লিঙ্গম নামক এক অন্ধকার ভূগর্ভে আশ্রয় নিলো। নোংরা, আলো-বাতাসহীন এই ভূগর্ভে কেবল উই, ইঁদুর আর বিষাক্ত পোকামাকড়ের রাজত্ব। পোকার কামড়ে পিঠে ক্ষতের সৃষ্টি হয়, দরদর ধারায় রক্ত ঝরে, রমণের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। ধ্যানমগ্ন সে।

এখানেও ধাওয়া করে দুষ্ট বালকের দল। দৌরাত্ম্য চরমে ওঠে। শেষাদ্রি ও বেঙ্কটরমণকে লক্ষ্য করে বড়ো বড়ো ইট ছুঁড়ছে তারা। এমন সময় সেখানে দেবদর্শনে এলেন বেঙ্কটাচল মুদালি নামে এক ভদ্রলোক। সম্মুখে গিয়ে যে দৃশ্য তিনি দেখলেন তাতে বিস্ময়ের সীমা রইলো না। মুদালি কয়েকজনের সাহায্যে বেঙ্কটরমণের ধ্যানমগ্ন দেহটি ধরাধরি করে বাইরে আনলেন। কীটের দংশনে পা এবং জানুর ক্ষত থেকে রক্ত ও পুঁজ ঝরছে, তবু ধ্যান ভাঙে না তার! এ অদ্ভুত দৃশ্য দেখার জন্য ভিড় জমে গেলো তখন।

সেইদিনই লোকলোচনের সম্মুখে শুরু হলো রমণ-মহর্ষি অভ্যুদয়।

রমণের জন্মস্থান মাদুরা শহরের ত্রিশ মাইল দূরের গণ্ডগ্রাম তিরু-চুঝি। পিতার নাম সুন্দরম্ আইয়ার। মাতার নাম আলাগাম্মাল। ভক্ত ও অতিথিবৎসল বলে এই ব্রাহ্মণ দম্পতী ঐ অঞ্চলে সুপরিচিত। ১৮৭৯ সালের ৩০শে ডিসেম্বর তাঁর জন্ম। দিনটি পুণ্যময় উৎসবের।

সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়ে রাত্রি একটার সময় শিব-বিগ্রহকে মন্দিরে ফিরিয়ে আনা হয়েছে, ঠিক সেই সময়ে ভূমিষ্ঠ হন এই শিবাংশ সম্ভূত দিব্যকান্ত শিশু।

রমণের বয়স তখন বারো, পিতা সুন্দরম্ হঠাৎ মারা গেলেন। বড়ো ভাই নাগস্বামীর সঙ্গে রমণকে যেতে হলো মাদুরায়, কাকার বাড়ি। রমণ অসাধারণ মেধার অধিকারী কিন্তু পড়াশোনা তেমন করে না।

একদিন কাকার বাড়িতে একজন নিকট আত্মীয় এলেন। রমণ তাকে প্রশ্ন করেন, আপনি কোথা থেকে আসছেন? অতি সাধারণ প্রশ্ন। অতি সাধারণ তার উত্তর : অরুণাচল!

মুহূর্তমধ্যে সারা অন্তরে ছড়িয়ে পড়লো ঐ নামের ঝঙ্কার। অরুণাচল! আমায় যেতে হবে সে-দেশে। কয়েক মাস পরে এক প্রসিদ্ধ তামিল গ্রন্থ পড়তে পড়তে সিদ্ধপুরুষদের অতীন্দ্রিয় রাজ্যের জন্য বুকটা টন্‌টন্ করে উঠলো তাঁর।

আরও কিছুদিন পরের কথা। এক অদ্ভুত অনুভূতির মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনে পরিবর্তন এলো। বাড়ির নির্জন কক্ষে বসে আছেন। অকস্মাৎ তিনি উপলব্ধি করলেন, মৃত্যুর যবনিকা তাঁর দেহ মন ও সমগ্র সত্তার উপর নেমে আসছে। এখনই প্রাণ বিয়োগ ঘটবে। ডাক্তার বা আত্মীয়স্বজনকে ডাকারও সময় নেই। মনে মনে নিজেই সঙ্কট ত্রাণের উপায় স্থির করলেন। শ্বাস-কুম্ভক করে বেঙ্কটরমণ তাঁর সমস্ত চিন্তাধারাকে, সমস্ত চেতনাকে সত্তার গভীরে ঠেলে নিয়ে গেলেন। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তিনি আত্মসত্তার শক্তি ও স্পন্দন অনুভব করলেন।

এর পর রমণের জীবনের সমস্ত কিছু আকর্ষণ ঐ আত্মার উপরই নিবদ্ধ হলো। ঐদিন রমণের মৃত্যু হয়নি। নবজন্ম হয়েছিলো, সংসার ছাড়ার জন্য ব্যাকুলতা বেড়েছিলো। ওঁদের বংশে বিশ-ত্রিশ বৎসর অন্তর কেউ না কেউ সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন। এবার রমণের পালা। কোনো অজানা আকর্ষণ বাইরের দিকে নিয়ে চলেছে তাকে।

চোখ বুজে প্রায়ই ধ্যানে বসেন রমণ। একদিন বড়ো ভাইয়ের চোখে পড়লো এই দৃশ্য, শ্লেষাত্মক মন্তব্য করলেন তিনি : ঘর-সংসারে থেকে তাহলে আর কি দরকার ?

দাদার এই কথা মর্মমূলে গিয়ে বিঁধলো। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কল্প স্থির হয়ে গেলো। এই ছলনার আশ্রয় নিলেন রমণ। বললেন, দাদা ! এক্ষুনি আমায় একবার স্কুলে যেতে হবে।

—বেশ তো, চলে যা। যাবার সময় পাঁচটা টাকা নিয়ে যাস্। আমার কলেজের মাইনে আজ দিতে হবে। দিয়ে আসিস্।

সুবর্ণ সুযোগ। পাঁচটাকার মধ্যে তিনটে টাকা পথের খরচের জন্য নিয়ে একটা চিঠি লিখে রেখে চিরকালের জন্য বেরিয়ে পড়লেন রমণ। গন্তব্যস্থল সেই অরুণাচল।

কিছুটা ট্রেনে, কিছুটা পায়ে হেঁটে, অনাহারে, পথশ্রমে, বহু কষ্ট স্বীকার করে পৌঁছালেন তাঁর পথ-চাওয়া তীর্থ অরুণাচলে। তারপর শুরু হলো তেষট্টি বছরের বিরামহীন তপস্যার জীবন। তিরুভান্না-মালাই-এর গাড়ি কিশোর সাধককে যেদিন তাঁর স্বপ্নলোক অরুণাচল-গিরির পাদমূলে এনে পৌঁছে দেয় সেদিন ১৮৮৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর। শুধু বেঙ্কটরমণের জীবনেই নয়, অগণিত মানুষের অধ্যাত্ম জীবনেও এই দিনটি হয়ে ওঠে চিরস্মরণীয়। সেদিনকার নবীন সাধক রূপান্তরিত হন রমণ মহর্ষিরূপে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শত শত মুমুক্ষু নর-নারী জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে এই মহাপুরুষের করুণাধারায় অভিসিঞ্চিত হলো।

প্রায় ছ'মাস বেঙ্কটরমণ সুব্রহ্মণ্যম মন্দিরে ছিলেন। ধ্যানতন্ময় অবস্থায় কাটে দিনের পর দিন। কখনো অর্ধবাহ্য, কখনো নিস্পন্দ অচৈতন্য। ক্ষুধা তৃষ্ণা রুচি অভিরুচি কিছুই নেই। স্থানীয় লোকেদের মধ্যে বেঙ্কটরমণ পরিচিত হয়ে ওঠেন ব্রহ্মণ্যস্বামী নামে।

অরুণাচলেই এক উৎসবের দিনে একটি ইলুপ্পাই গাছের নীচে কিশোর সাধক ধ্যানে বসেন। হঠাৎ সেদিন এসে উপস্থিত হলেন উদ্দণ্ডী নাইয়ার নামক এক ত্যাগী সাধক। ভবিষ্যতে তিনিই হয়ে

ওঠেন তাঁর প্রধান সেবক ও শিষ্য। তারপর এলেন আন্নামালাই তম্বিরণ। লোকের ভিড় এড়াবার জন্য ইনি গুরুকে নিয়ে গেলেন তাঁর নিজের বাড়িতে ; গুরুমূর্তমে। কিন্তু সেখানেও কম দুর্ভোগ তাঁর হয়নি। দর্শনার্থীর ভিড় ছাড়াও আর এক অত্যাচার—পোকামাকড়ের। গুরুর শরীরকে পোকামাকড়ের অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্য তাঁরা একটা উঁচু কাষ্ঠাসন স্থাপন করে তার পায়ার নীচে জলাধার রাখলেন। কিন্তু আত্মবিস্মৃত সাধক ধ্যানতন্ময় অবস্থার মন্দিরের দেওয়ালে এলিয়ে দিলেন তাঁর দেহ। ফলে আবার সেই পোকামাকড়ের অত্যাচার।

কীটের কামড়ে রক্ত ঝরে দেওয়াল গড়িয়ে নীচে পড়ে।

গুরুমূর্তমের এক নির্জন বাগানে সেদিন একলাটি ধ্যানাসনে রয়েছেন মৌনী রমণ। একদল চোর তেঁতুলগাছ থেকে তেঁতুল চুরি করতে এসে তাঁর প্রতি বিদ্রূপ বর্ষণ করলো, এমনকি চোখের ভিতর বিষ ঢেলে যাবে বলে শাসালো। চোখ দু'টি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কাতেও একটিবারের জন্যও মুখ খুললেন না রমণ। সুখের বিষয়, সেদিন বিপদ কিছু ঘটেনি।

গুরুমূর্তমে আর এক শিষ্য এলেন, তাঁর নাম পলনীস্বানী। কিশোর সাধকের কাছে তিনি নিজেকে বিকিয়ে দিলেন এবং ক্রমাগত একুশ বছর করলেন তাঁর চরণসেবা।

তম্বিরণ সেদিন গুরুর জন্য নিয়ে যাচ্ছেন ভোগান্ন। মন্দিরে ঢুকতেই তাঁর চোখ পড়লো দেয়ালের দিকে। কয়লার কালি দিয়ে তিনি লিখে রেখেছেন : এ দেহের জন্য দরকার শুধু এই খাবারটুকু। তামিল ভাষায় লেখা এই কয়েকটি কথায় ফুটে উঠেছে সাধকের সঙ্কল্প ও দৃঢ়চিত্ততা।

কিন্তু আরও একটি মূল্যবান তথ্য প্রকাশ পেলো। সেই লেখার মধ্য দিয়েই এতদিনে ভক্তরা জানলেন, রমণ তামিল ভাষায় ভালো

লিখতে পারেন। তবে কি তাঁর মাতৃভাষা তামিল ? তাই যদি হয়, তাহলে এঁর পূর্বাশ্রমের গৃহ কোথায় ?

আরম্ভ হলো পীড়াপীড়ি, গুরু রমণকে টলতে হলো। ইংরাজী অক্ষরে সংক্ষেপে লিখলেন : বেঙ্কটরমণ, তিরুচুঝি। এই ক্ষীণ পরিচয়ের সূত্র ধরে তাঁর সব পরিচয় প্রকাশিত হয়ে পড়লো। ছুটে এলেন ছোটকাকা। সব যুক্তিতর্ক সেদিন ব্যর্থ হয়ে গেলো। পুত্রের সংবাদ শুনে ছুটে এলেন মা আলগাম্মাল। রমণ তখন অরুণাচলের পার্শ্ববর্তী গিরিচূড়া পাবাঝাকুনরুতে আসন পেতে গভীর ধ্যানে মগ্ন। মায়ের সে কি অঝোর কান্না! প্রাণ থাকতে ছেলেকে, তাঁর নয়নমণিকে ছেড়ে যাবেন না। কিন্তু পাথরের মতো নির্বাক নিশ্চল হয়ে বসে আছেন রমণ। মায়ের এতো আর্ত অশ্রুজল ভাঙতে পারলো না তাঁর মৌন প্রশান্তি। ভক্তদের কাছে কেঁদে কেঁদে বললেন, ওগো তোমরা কি কেউ আমায় সাহায্য করবে না ?

একজন ভক্ত রমণের পায়ে অনুরোধ জানালেন। রমণ লিখে দিলেন একটা কাগজের টুকরোয় : পূর্বজন্মের কর্মফল অনুযায়ী ভগবান্ নিয়ন্ত্রণ করেন জীবের ভাগ্য !

মায়ের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হলো! ক্ষুণ্ণ মনে ফিরলেন তিনি।

কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে রমণের জীবনে এলো সিদ্ধি। নিভৃত তপস্যা ত্যাগ করে তিনি এবার এসে দাঁড়ালেন জীবনের প্রকাশ্য রাজপথে। শুরু হলো আচার্য জীবন। অরুণাচল পাহাড়ের কোলেই আশ্রয় নিয়ে রইলেন তিনি।

১৮৯৬ সালের প্রথম ভাগ। অরুণাচলের বিরূপাক্ষ গুহায় রমণ তাঁর আসন পেতে বসেছেন। বিশেষ বিশেষ উৎসবের দিন এই গুহায় ভিড় জমে যায় কিশোর স্বামীর দর্শনের আকাঙ্ক্ষায়। বিরূপাক্ষ মঠের কর্তৃপক্ষ আয় বাড়ানোর উদ্দেশ্যে যাত্রীদের উপর কর বসালেন। এই কর আদায়ের কথা, এই অত্যাচারের কথা রমণের কানে উঠলো। প্রতিবাদে তিনি বিরূপাক্ষ গুহা ত্যাগ করলেন। এবার মঠাধ্যক্ষের

চৈতন্য এলো। দর্শনী প্রথা উঠিয়ে দেওয়া হলো। রমণকে তাঁরা ফিরিয়ে আনলেন।

অরুণাচল এক পুরাতন তীর্থক্ষেত্র। শঙ্করাচার্য একে বলেছেন, মেরুপর্বত। স্কন্দপুরাণে একে বলা হয়েছে, মহাদেবের হৃদ্‌ক্ষেত্র। দাক্ষিণাত্যের পুরাণে অরুণাচলের নানা মহিমার কথা আছে। সর্ব-লোকের কল্যাণের জন্য স্বয়ং মহাদেব নাকি নয়নগ্রাহ্যরূপে অরুণাচলের আকার ধারণ করে এখানে বিরাজ করছেন।

মহর্ষি রমণ উত্তরকালে এক অলৌকিক কাহিনী বিবৃত করেন। এক বর্ষীয়ান্ ভক্ত এসেছিলেন অরুণাচল পরিক্রমায়। পা দু'টি তাঁর দীর্ঘদিন যাবৎ পঙ্গু। বৃদ্ধ সেজন্য আত্মীয়স্বজনের গলগ্রহ। হঠাৎ এক পরিচিত ব্রাহ্মণ তাঁর সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন। বৃদ্ধকে বললেন, হাতের লাঠি ফেলে তাঁর সঙ্গে যেতে। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন বৃদ্ধ, তাঁর পঙ্গু পা দু'টি সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এ হলো অরুণাচলেশ্বরের কৃপা! প্রাচীন পুরাণগাথায় আছে, এখানকার জাগ্রত শৈলের অধিষ্ঠাতা পুরুষ অরুণগিরি রোগীর কথা। পাহাড়ের কোলে এক বিরাট বটবৃক্ষের মূলে ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকেন সেই সূক্ষ্মদেহী মহাযোগী। সাধক রমণ সেই অরুণগিরি যোগীর করুণা লাভ করেন। ১৯০৬ সালের কথা। পাহাড়ের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছেন রমণ। হঠাৎ দেখলেন, এক প্রকাণ্ড বটের পাতা পড়ে আছে। খুব বিস্মিত হলেন তিনি। বটগাছ তো অরুণাচলের কোথাও নেই। কোথা থেকে এলো তবে এই পাতা? কৌতূহল ভরে আরও এগিয়ে চললেন তিনি। দুর্গম প্রস্তরাকীর্ণ পথ। কিছুদূরে হঠাৎ এক বিশাল বটবৃক্ষ দেখে বিস্মিত হলেন মহর্ষি রমণ। কঠিন পাথরের উপর সে গাছ গজিয়ে উঠেছে। এ কেমন রহস্য!

গাছটিকে লক্ষ্য করে রমণ এগোচ্ছেন। এমন সময় কোথা থেকে এক ঝাঁক ভীমরুল এসে তাঁর পায়ে কামড়ে ধরলো। শেষ পর্যন্ত তিনি

ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। শিষ্যদের সব কথা জানালেন তিনি। তাঁরা গিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন, সেই বটগাছ কিন্তু পেলেন না।

মনে হয়, অরুণগিরির সেই সূক্ষ্মদেহী মহাযোগীই সেদিন দেখা দিয়েছিলেন রমণকে।

আরও একদিনের কথা। রমণ সেদিন পার্বত্য পথে ভ্রমণ করছেন। চারিদিকে বনজঙ্গল। অকস্মাৎ এক বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা। জীর্ণ ময়লা এক শাড়ী পরনে, শুকনো কাঠকুটো কুড়োচ্ছেন। রমণকে তিনি তীক্ষ্নস্বরে তিরস্কার করলেন : কেন রে, যম কি তোকে ছোঁয় না? এমন করে রোদে রোদে ঘুরে মরছিস্ কেন? চুপচাপ একটা জায়গায় বসতে পারিস্ না?

এও একটা অলৌকিক ঘটনা। রমণ এই ঘটনার পর পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাস ছেড়ে দেন।

উত্তরকালে মহর্ষি রমণের জীবনে প্রকটিত হয় বহুতর লীলা। ভক্ত শিষ্য ও শিষ্যারা তাঁর সেই অলৌকিক লীলায় পরম প্রশান্তি লাভ করেন।

শিষ্যা এচাম্মলের অভিজ্ঞতা এখানে বর্ণনা করা যায়। স্বামী পুত্র কন্যা সকলকে হারিয়ে তিনি মহর্ষির শ্রীচরণে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর এক পালিতা কন্যা ছিলো। মহা ধূমধামে তার বিয়ে দেওয়া হয়। সেই পালিতা কন্যাও অকালে মারা গেলো একটি ছেলে রেখে। এই দুঃসংবাদ শুনে এচাম্মলের পালিতা কন্যার ছেলেটিকে কোলে নিয়ে কতো কেঁদেছিলেন মহর্ষি নিজে। এ হলো তাঁর দুঃখিনী শিষ্যার শোকে অংশ নেওয়া।

এচাম্মল রোজ খাবার নিয়ে যেতেন বিরূপাক্ষ গুহায়। একদিন হঠাৎ দেখলেন, পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে একজন অপরিচিতের সঙ্গে কথা বলছেন রমণ। সহাস্যে তিনি শিষ্যাকে বললেন, শুধু শুধু কষ্ট করে আর ওপরে যাও কেন বলো তো? আমি তো নীচে এখানেই রয়েছি।

অপরিচিত লোকটি থাকায় এচাম্মলের আর কিছু বলা হলো না। খাবার নিয়ে যথারীতি উপরে উঠে গুহায় প্রবেশ করে এচাম্মল বিস্মিত হলেন। প্রভু এক দর্শনার্থী পণ্ডিতের সঙ্গে প্রশান্তভাবে কথাবার্তা বলছেন। একি অলৌকিক কাণ্ড! এচাম্মলের মনের এই অবস্থা বুঝতে পেরে রমণ মৃদু হেসে বললেন, কি গো? আজ এমনধারা ভাব কেন তোমার?

এচাম্মল কম্প্রকণ্ঠে সব বললেন।

অভ্যাগত পণ্ডিত এ কাহিনী শুনে অবাক।' মহর্ষি কিন্তু হেসেই উত্তর দিলেন, ও আমার কথাই ভাবে, আমাকেই ধ্যান করে। তাই ও রকম দেখেছে।,

সেবার এক ইউরোপীয় দর্শনার্থী রমণের আশ্রমে এসে শৈলের নানা অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে পথ হারিয়ে ফেললেন। তাঁর ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে সকলে চিন্তিত—শেষে তিনি ফিরে এসে বললেন, পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। এমন সময় হঠাৎ মহর্ষি রমণের সঙ্গে দেখা। তিনিই আশ্রমে এগিয়ে দিলেন। শিষ্যেরা অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। কারণ, মহর্ষি সর্বক্ষণ তাঁদের কাছেই ছিলেন।

আরও পরবর্তী কালের কথা। গুটিকয়েক শিষ্য নিয়ে রমণ আশ্রমে বাস করছেন। এক রাত্রিতে একদল দুর্ধর্ষ চোর উপস্থিত হয়ে ঘরের জানলা-দরজা ভাঙতে থাকে। শিষ্যেরা লাঠিসোটা নিয়ে প্রস্তুত। রমণ বাধা দিলেন শিষ্যদের। চোরদের বললেন, তোমরা ব্যস্ত হয়ো না। আমরা বাধা দেবো না। এই বলে আশ্রমের পালিত কুকুরকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে তাঁরা আশ্রম গৃহ থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তস্করেরা কিন্তু রমণের এই আশ্বাসকে অভিসন্ধিমূলক মনে করলো। তারা রমণের পায়ে সজোরে লাঠি মেরে বসলো। তবুও শান্তস্বরে রমণ বললেন, এতেও যদি খুশি না হয়ে থাকো, তবে আরও একটা পা জখম করতে পারো।

এই সময় শিষ্য রামকৃষ্ণস্বামী ছুটে এসে গুরুকে আগলে ধরলেন। গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন রমণ, শিষ্যরাও কিছু কিছু। তবুও হাসতে হাসতে বলেছিলেন রমণ, আমিও ওদের পুজো কিছুটা পেয়েছি।

এক্ষেত্রে সাধুর ধর্ম পালন করার এক আশ্চর্য বলিষ্ঠ শিক্ষা দিয়েছিলেন রমণ মহর্ষি।

মহর্ষির এক শিষ্যের নাম কাব্যকণ্ঠ গণপতি শাস্ত্রী। ইনি শাস্ত্রবিদ্ ও পণ্ডিত ছিলেন। 'ভগবান্ শ্রীরমণ' বা 'রমণ মহর্ষি' নাম তাঁরই দেওয়া। বিরূপাক্ষ গুহায় উপস্থিত হয়ে একদিন তিনি রমণের শ্রীচরণে আশ্রয় নেন এবং জীবন-তপস্যায় সফল হবার পথনির্দেশ ভিক্ষা করেন।

এক বৎসর পরে মহর্ষির কৃপা গণপতির জীবনে হঠাৎ এক অলৌকিক লীলার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। তিরুবত্তিয়ুরএর মন্দিরে ধ্যান জপ করবার সময় অকস্মাৎ তাঁর অন্তরে প্রবল ইচ্ছা জাগলো মহর্ষিকে দর্শন করবার। কিছুক্ষণের মধ্যেই মহর্ষি মন্দির মধ্যে আবির্ভূত হলেন। শুধু তাই নয়, মহর্ষি তার মস্তক স্পর্শ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সারা দেহে দিব্যরসের তরঙ্গ বয়ে গেলো।

অথচ রমণ একটি দিনের জন্যও সেখানে যাননি। জীবনে কোনদিন সেই স্থান দর্শন করেননি। তবে, সেদিন যে তাঁর দেহটি বহু ঊর্ধ্বে—আকাশে উঠে যাওয়ারও কিছুক্ষণ পরে নীচে নামার অভিজ্ঞতা অনুভব করেছিল, তা শিষ্যের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন মহর্ষি।

ইংরেজ তরুণ এফ. এইচ. হামফ্রিজের জীবনে মহর্ষির প্রভাব সঞ্চারিত হয় এক লোকোত্তর লীলার মাধ্যমে। এ কাহিনী বড়ো বিস্ময়কর। পুলিশের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসাবে তিনি ভেলোরে আসেন। অরুণাচল থেকে এই শহরটির দূরত্ব মাত্র এক মাইল। হামফ্রিজ এসময় মুন্সি নরসিংহায়ার কাছে তেলুগু ভাষা শিখছেন।

দু'দিন পর হামফ্রিজ বললেন, আমি তোমার গুরুদেবকে দেখে

ফেলেছি মুন্সিজী, স্বপ্নে। জানো, ভেলোর শহরের যে লোকটিকে আমি বোম্বেতে থাকতে সর্বপ্রথম দেখেছি, সে তুমি।

নরসিংহায়া একথা শুনে অবাক।

তিনি আরও বললেন, আমি অসুস্থ হয়ে কয়েকদিন হাসপাতালে ছিলাম। চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একদিন ভেলোরে যাওয়ার চিন্তা মনে জাগলো এবং সঙ্গে সঙ্গে হলো এক অলৌকিক অভিজ্ঞতা। কোন এক অদৃশ্য শক্তির কৃপায় সূক্ষ্মদেহে তিনি ভ্রমণ করতে থাকেন এবং সেই সময় দেখা হয় নরসিংহায়ার সঙ্গে।

কথা শুনে সন্দেহের দোলায় দুলতে থাকে নরসিংহায়ার মন। কিছুদিন পর সব সন্দেহ দূর হলো। নরসিংহায়ার হাতে সেদিন একগাদা ছবি। সেই ছবিগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে গুরু রমণের ছবিটি দেখেই হামফ্রিজ বললেন, ইনি আমার বড়ো চেনা। হামফ্রিজ পেন্সিলে ছবি আঁকলেন, ফুটে উঠলো। রমণ মহর্ষি ও তাঁর আশ্রম গুহার সমগ্র ছবি। তারপর সহাস্যে বললেন, হুবহু এই চিত্রটিই সেদিন আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম।

এরপর হামফ্রিজ মহর্ষিকে দর্শন করেন। পরবর্তীকালে তিনি চাকুরী ছেড়ে দেশে চলে যান এবং পরম কল্যাণের পথ বেছে নিয়ে ক্যাথলিক সন্ন্যাসীদের মঠে যোগদান করেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রান্টন নামক আরও একজন বিখ্যাত ইংরেজ সাংবাদিক মহর্ষিকে দর্শন করে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে রমণের মাতা স্থায়ীভাবে ছেলের কাছে এসে বাস করেন। এইসময়ে মাতা ছেলের নানা অলৌকিক রূপ দেখতে পান। রমণ মায়ের সেবা করতেন কিন্তু মাতৃত্বের দাবী ও অধিকার সম্বন্ধে জননীর বেশী সচেতন হবার উপায় ছিল না। রমণ বলতেন, জেনে রেখো, সব নারীই আমার জননী, তুমি একা নও!

রমণের আশ্রমেই তাঁর মা মারা যান।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে রমণ মহর্ষির দেহে এক বিষাক্ত টিউমার দেখা দেয়। নানা চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার সত্ত্বেও ঠেকানো গেলো না। ধীরে ধীরে অবস্থা খারাপের দিকে গেলো। একদিন সকলকে প্রবোধ দেবার জন্য বললেন, দেখো, এই দেহটা হচ্ছে কদলীপত্র। এর ওপর অনেক কিছু মুখরোচক খাবার সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ভোজন শেষ হয়ে গেলে আমরা ঐ পাতা ফেলে দেবো। এ দেহের জন্যে দুঃখ করা কি ভালো ?

সেই সময়ে একদিন হঠাৎ সারা আশ্রমে ঘনিয়ে এলো বিষাদের ছায়া। মহাপ্রয়াণের আগের দিন মহর্ষি সংক্ষেপে বললেন, ব্যস্, আর কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই, দু'দিনের, ভেতর সব ঠিক হয়ে যাবে।

তাই হলো। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল। ভক্তবৃন্দের দিকে গভীর স্নেহে তাকিয়ে রমণ বললেন, ইংরেজদের ভাষায় একটা কথা রয়েছে, থ্যাঙ্কস্। আমরা বলি সন্তোষম্।

অর্থাৎ ভক্তদের দীর্ঘ সাহচার্য ও সেবার স্বীকৃতি দিয়ে বিদায় নিলেন মহর্ষি। দীর্ঘকাল আগে অরুণাচলের যে হাতছানি পেয়ে ঘরছাড়া হয়েছিলেন কিশোর, সেই অরুণাচলের পরমসত্তায় লীন হলেন তিনি। তাঁর প্রাণবায়ু উৎক্রমণের মুহূর্তে চকিত উদ্ভাসনের মধ্য দিয়ে একটা উজ্জ্বল নক্ষত্রকে আশ্রমের উপরিভাগ দিয়ে ছুটে চলে যেতে দেখা গেলো।

সাইবাবা

ষোল বছরের তরুণ ফকীর। অঙ্গে ধুলামলিন ছিন্ন বাস, মাথায় জড়ানো ছোটো একটা চাদর। চোখ দু'টি স্বপ্নালু ভাবময়। আমেদাবাদ জেলার শিরডি গ্রামে সে নবাগত। গ্রামের একদিকে জঙ্গল। সেখানে নিমগাছের গুঁড়ির প্রকাণ্ড কোটরে তার বাসস্থান। সেখানেই চলে সাধনভজন।

কয়েক বছর পর ফকীর নিমগাছের আশ্রয় ছেড়ে এলেন শিরডির মসজিদে।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের এক চিহ্নিত রাত্রে ঘটলো এক অলৌকিক ঘটনা। তরুণ সাধক একদল লোককে বড়ো বড়ো সাধকের বিস্ময়কর সিদ্ধাই কাহিনী শোনাচ্ছেন। কোনো ক্লান্তি নেই বক্তা বা শ্রোতাদের মধ্যে, রাত্রি গভীর হলো। ঘরের জীর্ণ লণ্ঠনটার শিখা ক্রমে স্তিমিত হয়ে এলো। কেরোসিন নিঃশেষিত। তা হোক্, ঘরে জল তো রয়েছে। তরুণ সাধক লোটা থেকে বেশ খানিকটা জল ঢেলে দিলেন লণ্ঠনে। যতবার তেলের প্রয়োজন হয় ততবার ফকীর জল ঢালেন। এমনিভাবে রাত পোহালো।

পরদিন শিরডি গ্রামের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ফকীরের অলৌকিক শক্তির কথা। নূতনতর শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে উচ্চারিত হতে লাগলো ফকীরের নাম।

সামনে সর্বদা জ্বলছে এক ধুনি। রোগ, শোক, অন্তরের ব্যথা বা অশ্রুজল নিয়ে যারাই আশ্রয় নেয়, তাদেরই ভাগ্যে মেলে ধুনির এক মুঠো ভস্ম, দূর হয়ে যায় সমস্ত দুঃখ, বেদনা। দীনের শরণ, আর্তের ত্রাতা এই ফকীরই ক্রমে সাধারণের মধ্যে পরিচিত হয়ে ওঠেন সাইবাবা নামে। তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র মারাঠা দেশ, তারপর সমগ্র

দাক্ষিণাত্যে। কিন্তু মুসলমান ক্রিশ্চান পার্শি সব ধর্ম ও সমাজের ভক্ত আর বিশ্বাসী মানুষ এই মহাত্মার আকর্ষণে ছুটে আসতে থাকে। মহা মনীষী বাল গঙ্গাধর তিলক থেকে শুরু করে দাক্ষিণাত্যের গণ্যমান্য ইংরেজ রাজপুরুষ ও দেশীয় রাজারাজড়াদেরও দেখা যায় সেখানে। নব রঙ্গমঞ্চে নব অভিনয় আরম্ভ হয়। দক্ষিণা, উপঢৌকন ও নজরানা স্তূপীকৃত হয় তাঁর পায়ের কাছে। রুপোর গাড়িতে বসিয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়, সঙ্গে চলে জরীর ঝালর দেওয়া ছাতা ও আশাসোঁটা নিয়ে অগণিত ভক্ত। কিন্তু এতো ঐশ্বর্য ও আড়ম্বর সত্বেও কোনো ক্ষতি হয় না সাইবাবার ত্যাগ তিতিক্ষার মহনীয় সাধনার। একটি তাম্রমুদ্রাও তিনি রাখেন না নিজের জন্য। খোলামকুচির মতন অবলীলায় সব কিছু বিলিয়ে দেন প্রার্থীদের মধ্যে।

শুধু দূরসন্ধানী দৃষ্টিই নয়, দূরপ্রসারী শক্তিও তাঁর রয়েছে। আশ্রয় প্রার্থীদের কাতর প্রার্থনায় বাবার অন্তর করুণায় উদ্বেল হয়ে ওঠে। তিনি আশীর্বাণী উচ্চারণ করেন আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় প্রার্থীর প্রার্থনা হয়েছে পূর্ণ।

সাইবাবার নাম ও মাহাত্ম্য প্রচারে যাঁরা মেতে ওঠেন, নারায়ণ গোবিন্দ চান্দোরকার ছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রণী। সকলে তাঁকে নানাসাহেব বলতো। রাজস্ব বিভাগের এক বিশিষ্ট পদাধিকারী ছিলেন নানাসাহেব। কর্মসূত্রে কোপারগাঁও এ এসে তাঁবু ফেলেছিলেন ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। চেনা নেই, শোনা নেই, দেখা নেই,—অথচ সাইবাবার কাছ থেকে ডাক এলো তাঁর, দেখা করার জন্য। প্রথমটা ভালো লাগেনি নানাসাহেবের, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতে বাধ্য হয়েছিলেন সাইবাবার কাছে। যেন পুরোনো মনিব ডাক দিয়েছেন তাঁকে।

কিছুদিন পরের কথা। নানাসাহেব কি একটা কাজে গিয়েছেন হরিশচন্দ্র পাহাড়ে। তখন গ্রীষ্মকাল। জল সংগ্রহ করা সেখানে বড়ই কঠিন। শ্রান্ত-ক্লান্ত নানাসাহেব জলের অভাবে বিপদে পড়লেন। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাবার উপক্রম। তাঁর সঙ্গীটি চারিদিকে দৌড়-

ঝাঁপ কম করলেন না। হতাশ হয়ে সেখানে বসে পড়লেন দু'জনে নিশ্চিন্ত মৃত্যুর মুখোমুখী, এমন সময় সেখানে এক পাহাড়িয়া ভিল এসে উপস্থিত। কাতরকণ্ঠে নানা বললেন, হ্যাঁ ভাই, এখানে কোথায় একটু জল পাবো বলতে পারো ?

ভীল হেসে বললেন, যেজন্য ছট্‌ফট করছো তা যে তোমার পায়ের নীচেই আছে। যে পাথরের ওপর বসেছো, সেটা একবার একটু সরিয়ে দেখো।

দু'জনে মিলে পাথর ঠেলে সরালেন। তারপর বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে দেখলেন, নীচে দিয়ে এক ক্ষীণকায় পর্বত্য ঝরণা ঝিরঝির করে বয়ে যাচ্ছে, অঞ্জলি ভরে জলপান করে সেদিন তাঁরা বাঁচলেন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে শিরডিতে আসতেই সাইবাবা স্মিতহাস্যে নানাকে বললেন, কিগো, দেখলে ? ভগবানের কৃপা থাকলে পাথরের ভেতর থেকেই জল বেরোয়।

সামনে যে ভক্তরা ছিলেন তাঁরা জানালেন, কয়েকদিন আগে দুপুরে বাবা হঠাৎ বার বার বলেছিলেন, তাই তো! কি করা যায় বলো তো ? নানা যে তৃষ্ণায় মরে যাচ্ছে !

উত্তর ভারতের এক প্রবীণ জজের জীবনেও তাঁর করুণা একদিন অলৌকিকভাবে দেখা দেয়। তিনি ছিলেন ধর্মপরায়ণ। নারায়ণ শিলা পূজা করতেন। একদিন তাঁর অলৌকিক দর্শন ঘটলো। দেখলেন, দেহটা তাঁর সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে আর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন নারায়ণ ও আর একজন অপরিচিত মহাপুরুষ। নারায়ণ বললেন, এই হচ্ছে তার অধ্যাত্মজীবনের পরিচালক, শিরডির সাইবাবা।

এরপর তাঁর দেহখানা মহাশূন্যে ভাসতে ভাসতে গিয়ে পড়লো শিরডিতে সাইবাবার সামনে।

এরপর জজ সাহেব সাইবাবার দর্শনে যান। তাঁকে প্রণাম করতেই

সাইবাবা রুক্ষস্বরে বললেন, এ আবার কি ? মানুষের পায়ে মাথা খোঁড়া কেন ? মানুষ কেন মানুষকে ভজনা করবে ?

জজের হৃদয় কেঁপে উঠলো, কারণ আধুনিক শিক্ষার গরিমায় এই রকম চিন্তাই তিনি করতেন। সাইবাবা তাহলে অন্তর্যামী !

বেলা দ্বিপ্রহরে মসজিদ যখন জনশূন্য হলো তখন কিন্তু আশ্চর্য ব্যবহার করলেন সাইবাবা। তাঁকে ডেকে এনে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন,—ওরে, তুই যে আমার সন্তান, আমার আপনজন। ভিড় থাকলে আমি ইচ্ছে করেই নিজের ছেলেদের সরিয়ে রাখি। আয় আয়, কাছে আয়।

শত শত লোক সাইবাবার আশীর্বাদে প্রাণ পেয়েছে, মারাত্মক ব্যাধির যন্ত্রণা এড়িয়েছে, সন্তান লাভ করার পর কত গৃহে আনন্দের বন্যা বয়েছে। তাঁরই আশীর্বাদে শান্তারাম বলবন্ত নাচ্‌নের স্ত্রী এক বিশিষ্ট সাধক সন্তানের জন্ম দেন। কালুরাম নামক এই শিশু প্রায় সারাদিনই সাধন-ভজন আর পূজাঅর্চনায় দিন কাটাতো এবং কৃষ্ণ দর্শনের অলৌকিক কাহিনী লোককে শোনাতো।

পুণা জেলার জুন্নের গ্রামের ভীমজী প্যাটেল ছিলেন যক্ষ্মারোগী। মরণাপন্ন অবস্থায় সাইবাবার শরণাপন্ন হয়েছিলেন তিনি। ধুনি থেকে খানিকটা উধি নিয়ে সাইবাবা তাঁর মাথায় দিতেই ন্যুব্জদেহ রোগী সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, কিছুদিনের মধ্যে রোগমুক্ত হয়ে তিনি ঘরে ফিরেছিলেন।

সেবার শিরডি অঞ্চলে ভয়ঙ্কর প্লেগ দেখা দিয়েছে। সাইবাবার ভক্ত জি. এস. খাপার্দে সপরিবারে সেখানে এলেন। খাপার্দের পুত্র বলবন্ত হলেন প্লেগ রোগাক্রান্ত। খাপার্দের স্ত্রী কান্নাকাটি করে অনুমতি চাইলেন, ছেলেকে নিয়ে শিরডি ছেড়ে চলে যাবার। চিকিৎসা না করালে ছেলে যে বাঁচবে না ! সাইবাবা কিন্তু সান্ত্বনা দিতে লাগলেন, কোনো ভয় নেই, মা ! তারপর দেখা গেলো, সাইবাবার গায়ে ভীষণ জ্বর আর কুঁচকি দুটো ভীষণ ফোলা। ওদিকে

বলবন্তের রোগ হলো প্রশমিত। ভক্তদের বুঝতে বাকি রইলো না, কৃপাময় সাইবাবা নিজদেহে ঐ প্রাণান্তকর রোগ টেনে এনে বলবন্তকে বাঁচালেন।

বাবাকে প্রায়ই আক্ষেপ করতে শোনা যেতো, আমার কাছে এরা সব ছুটে আসে কাকের মতো দু'টুকরো পচা নোংরা পরিত্যক্ত মাংসের লোভে। রাজহংসের মতো জ্ঞান-মুক্তোফল কুড়োতে ক'জনাই বা আসে?

কপটচারী জিজ্ঞাসুদের বাইরের মুখোশটাও অনেক সময় তাঁর দক্ষিণার চাপে খসে পড়তো। বোম্বাই থেকে আগত এক ধনাঢ্য ব্যক্তিকে একবার তিনি রীতিমতো শিক্ষা দেন। ভদ্রলোক বাইরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে তাড়াহুড়ো করে এসে ধরেছিলেন, 'কৃপা করে আজ আমায় ঈশ্বর দর্শন করিয়ে দিন।' সাইবাবা তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, ঈশ্বরলাভের পথ বড়ো দুর্গম। মানসম্মান, টাকাকড়ি কোন কিছুর আকর্ষণ থাকলে চলবে না!

মিসেস ম্যানেজার্স নামে এক বিদেশিনী সেদিন বসেছিলেন সাইবাবার ধুনির পাশে। হঠাৎ বিকট দর্শন এক কুষ্ঠরোগী সেখানে প্রবেশ করায় অস্বস্তি ও ঘৃণায় মুখে কাপড় দিলেন মহিলা। ক্ষোভে আর রোষে তাঁর দিকে চাইলেন সাইবাবা। শুধু তাই নয়, কুষ্ঠরোগীর হাতের পোঁটলাটি টেনে তার থেকে যে পেঁড়া বেরুলো সেটি তুলে ধরলেন শ্রীমতী ম্যানেজার্সের মুখের কাছে। এ এক কঠিন পরীক্ষা। মহিলা সেটি খেতে বাধ্য হলেন। তিনি নিজেই পরে এবিষয়ে লিখেছেন, আমাকে তিনি শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। আমাকে উপলব্ধি করাতে চেয়েছিলেন সমদর্শিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহনশীলতা।

বি. ভি. দেব সাইবাবার একজন একনিষ্ঠ ভক্ত। থাকতেন দাহানু নামক স্থানে। বাড়িতে এক মহোৎসব হবে। তাঁর ইচ্ছা সাইবাবা উৎসবে উপস্থিত থাকেন। বাবা কথা দিলেন আমি যাবো। সঙ্গে দু'জন ভক্ত থাকবে!

কিন্তু উৎসবের দিন তাকে দেখা গেলো না। ভক্ত পরে অভিযোগ করে পত্র দিতে সাইবাবা বললেন, ওকে লিখে দাও, আমি দু'জন সঙ্গী নিয়ে সাধুর বেশে ভোজন করে এসেছি। সে যেন মনে করে দেখে, আমি তাকে সেখানে বলেছিলাম—শুধু খেতেই আমি এসেছি, টাকা-কড়ির জন্য নয়।

দেবের ভুল ভাঙলো। বাবাকে চিনতে না পারায় অনুশোচনায় মন ভরে গেলো।

ভক্তদের প্রতিটি কর্ম, প্রতিটি আচরণ ও চিন্তার উপর সাইবাবা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখতেন। কখনো ভর্ৎসনায়, কখনো আশ্বাস ও প্রবোধবাক্যে তাদের চালিত করতেন। যেমন নানাসাহেবকে তিনি তিরস্কার করেছিলেন কয়েকবার। সাইবাবার ঘরে বসে এক পরমাসুন্দরী মুসলমান মহিলাকে দেখে তাঁর মন টলেছিলো। বাবা তৎক্ষণাৎ মৃদু চপেটাঘাত করেছিলেন।

নানাসাহেব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন শিরডির কাছাকাছি কোপার গাঁয়ের দত্তাজীর মন্দিরের সিঁড়ি তৈরীর জন্য কিছু টাকা দেবেন। কিন্তু তিনি তা দেননি, এবং সেই কারণে সাইবাবার কাছে আসার সময় দত্তাজীর মন্দির এড়িয়ে ঘুরপথে গিয়েছিলেন। বাবা গম্ভীর ও রুষ্ট মনে বসে রইলেন, কোনো সম্ভাষণ জানালেন না নানাকে। অবাক নানা কারণ জানতে চাইতে বাবা বললেন, যারা কথা দিয়ে তা রক্ষা করে না তাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে চাই না। দত্তাজীর মন্দির এড়িয়ে কেন এসেছো আমি সব জানি! তুমি না কথা দিয়েছিলে—তিনশো টাকা দেবে ওঁদের মন্দিরের জন্যে?

আর একবার তিনি বললেন, দেখো নানা, কোনো ভিক্ষুক যদি তোমার কাছে খাবার বা অর্থ চায়, তোমার সাধ্যমত তাকে দেবার চেষ্টা ক'রো। কোনো সময়েই বিরক্তি প্রকাশ ক'রো না।

সাইবাবার এই উপদেশ বিস্মৃত হয়ে নানা সাহেব একজন ভিখারীকে একবার কটু কথা বলে দুর্ব্যবহার করেছিলেন এবং

অন্তর্যামী সাইবাবা এর জন্য তীব্র তিরস্কার করেছিলেন তাঁকে।

সাইবাবার চরিত সঙ্কলয়িতা বি. ভি. নরসিংহ স্বামী তাঁর গ্রন্থে একটি মনোরম কাহিনী বর্ণনা করেছেন। সেটি হচ্ছে :

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে। রামনবমীর উৎসব উপলক্ষে শিরডিতে সেদিন অনেক লোক জমেছে। দূর গ্রাম থেকে এক গরীব বৃদ্ধাও এসেছেন সাইবাবার দর্শনে। কাছে পৌঁছাতে না পেরে সে চেঁচাচ্ছে, ওগো! আমি অসক্ত বুড়ো মানুষ। তোমরা আমায় একটু সাহায্য করো। বাবা! বাবা! তুমি কোথায়? আমায় কৃপা করে দর্শন দাও।

এক সেবক ভিড় ঠেলে বৃদ্ধাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলো। মহাপুরুষকে আবেগ কম্পিত দেহে জড়িয়ে বৃদ্ধা কাঁদতে লাগলো। সাইবাবার চোখ দু'টিও জলে ভরে গেলো। ব্যগ্রস্বরে তিনি বললেন, মা! তুমি তাহলে এসে পড়েছো? কতদিন ধরে তোমার জন্যে আমি প্রতীক্ষা করে আছি, ব্যাকুল হয়ে কাঁদছি। দাও, আমার জন্যে কি খাবার এনেছো, এবার তা সব বের করো।

বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি তার ছিন্ন ময়লা পুঁটলী থেকে বাসি রুটি বের করে বললো, এই যে বাবা। পথে খিদে পেয়েছিলো, আধখানা খেয়ে ফেলেছি। বাকিটা রয়েছে, ধরো, তুমি খাও।

সাইবাবা শিশুর মতো তা গ্রহণ করলেন। বললেন, সত্যি মা! কি চমৎকার রুটি। কি তৃপ্তিই আমার হলো!

একবার স্বর্ণালঙ্কার চুরির দায়ে অভিযুক্ত এক ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সাইবাবাকে সাক্ষী মেনে বসেছিলো। সেই সূত্রে কোর্টের পক্ষ থেকে এক কমিশনার এসে তাঁকে প্রশ্নাদি করেন এবং সাইবাবা তার কৌতূহলোদ্দীপক উত্তর দেন।

—আপনার নাম কি?

—সাইবাবা বলে সবাই আমায় ডাকে।

—আপনার বাবার নাম?

—তাও সাইবাবা।

—আপনার গুরুর নাম ?

—ভেনকুশ।

—আপনি কোন্ ধর্মের অনুবর্তী ?

—কবীরপন্থী।

—আপনার জাতি ?

—বলা যায় ঐশ্বরীয় !

—বয়স কতো বলুন তো ?

—লক্ষ লক্ষ বৎসর।

কমিশনার সাহেব তাঁর এই ধরনের উত্তরে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু উপরোক্ত উত্তরে তাঁর জীবনদর্শনের উত্তর মেলে।

সাইবাবা তাঁর গুরুর নামটি সঠিক জানিয়ে যাননি। তবে সব সময়ই তাঁর নাম বলতেন ভেনকুশ।

শুধু ত্রিতাপক্লিষ্ট জনগণই নয়, উন্নত শ্রেণীর সাধক, সাধু ও ফকীরেরাও সাইবাবাকে দর্শন করতে আসতেন। প্রয়োজন হলে সাইবাবা কাউকে কাউকে প্রত্যাখ্যানও করতেন।

সোমদেব স্বামী নামক এক সাধু সাইবাবার খ্যাতি শুনে তাঁকে দেখতে এলেন। মসজিদের উপর উড্ডীয়মান এক পতাকা দেখে তিনি ভাবলেন, এ আবার কি ব্যাপার ! গর্বভরে এমন করে পতাকা ওড়ানো কি সাধুর সাজে !

সোমদেব স্বামী সাইবাবার কক্ষে প্রবেশ করা মাত্র দেখলেন তাঁর বজ্রকঠোর মূর্তি। উত্তেজিত হয়ে তিরস্কার শুরু করলেন তিনি, সাবধান ! আর কখনো এ-মসজিদ মাড়াবি না। যে পতাকা ওড়ায়, অহঙ্কারের ধ্বজা যে বহন করে তার কাছে আবার আসা কেন ?

নাসিকের প্রসিদ্ধ শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ মূলে শাস্ত্রী তাঁর কাছে আসছেন, এটা আগেই জানতে পেরেছিলেন সাইবাবা। তাই তিনি বললেন,

ওরে, তোরা আমার কৌপীন আর বহির্বাসে শীগ্‌গির গেরুয়া রঙের ছোপ লাগিয়ে দে !

একথা শুনে সকলে মহা বিস্মিত। ওদিকে যথাসময়ে মূলে শাস্ত্রী এসে সাইবাবার সামনে দাঁড়িয়ে 'জয় গুরু! জয় ধোলাপ মহারাজজী!' বলে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়লেন।

পরে মূলে শাস্ত্রীজীর কাছে জানা গেলো, গৈরিক বেশধারী সাই-বাবার মধ্যে তিনি তাঁর ধোলাপ মহারাজকে দেখতে পেয়েছিলেন।

পশ্চিম ভারতের এক স্বনামখ্যাত সাধক ছিলেন উপাসনী মহারাজ। একবার হঠযোগের একটি বিশেষ পদ্ধতি আয়ত্তের চেষ্টায় তিনি এমন অসুস্থ হয়ে পড়েন যে, প্রাণ-সঙ্কট দেখা দেয়। সাইবাবা অলৌকিক মূর্তি ধরে তাঁর কাছে আবির্ভূত হন। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যৎকালে উপাসনী মহারাজ তাঁর কাছে উচ্চতর সাধনার কতকগুলি প্রণালী শিখে সাধকসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

সাইবাবার বাসস্থান একটি মসজিদে, কিন্তু সাইবাবা এটিকে অভিহিত করতেন দ্বারকামাঈ নামে। দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে থাকতো কাবা মসজিদের একটি প্রতীক। ঘরের এক কোণে বেদীতে রাখা ছিলো পবিত্র কুলনীর ঝাড়। বাবার সম্মুখে পর্যায়ক্রমে পাঠ করা হতো হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থ ও মুসলমানদের কোরান হাদিস্।

মসজিদটি পুরোনো হওয়ায় এক হিন্দু ভক্তের অভিলাষ জাগে, এটি পুনর্গঠন করার। বহু সংখ্যক মূল্যবান পাথর সংগ্রহ করে আনলেন তিনি। বাবা কিন্তু সেগুলি অন্য কাজে লাগিয়ে দিলেন। শিরডির একটি হিন্দু মন্দির সে সময় ভগ্ন দশায় ছিলো, সেই মন্দির সংস্কারে সেগুলি ব্যবহৃত হলো। এই দেখে বাবার শিষ্যরা উদ্যোগী হয়ে কয়েক সহস্র টাকা সংগ্রহ করলেন এবং মসজিদটি নূতন করে গড়ে তুললেন।

এই মহাপুরুষ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রায় চৌদ্দ দিন শয্যাশায়ী অবস্থায় থাকেন। তাঁরই নির্দেশক্রমে এক

নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ তাঁর সামনে রামবিজয়-চম্পু পাঠ করে শোনাতে লাগলো। বাবা প্রসন্ন মনে তা শুনতে লাগলেন। শিরডির কাছে থাকতেন এক শক্তিমান্ ফকীর। বাবা ঐ ফকীরের কাছে তাঁর শেষ বার্তা পাঠালেন, এ দেহের আধারে আল্লাহ্ যে আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন এবার তা নেবেন ফিরিয়ে।

১৮ই অক্টোবর। সেদিন শারদীয়া দশমীর পুণ্যদিন। অপরাহ্ণে বাবা হঠাৎ এক ভক্তকে ডেকে বললেন, ওরে—এবার আমার ডাক এসেছে। আমি বিদায় নিচ্ছি।

বেলা প্রায় তিনটের সময় পুণ্যচরিত সাইবাবা তাঁর নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করেন। এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সেদিন ভারতের আকাশ থেকে খসে যায়।

শ্রীঅরবিন্দ

আধুনিক ভারতের ধর্মজীবনে বাংলার হুগলী জেলার অবদান প্রায় অতুলনীয়। রামমোহন, রামকৃষ্ণ ও অরবিন্দ,—ভারতের এই তিন ধর্মনেতাকে হুগলী এক শতাব্দীর মধ্যে উপহার দিয়েছে। কোন্নগর এই জেলারই এক ক্ষুদ্র জনপদ। এখানকার প্রসিদ্ধ কায়স্থ বংশে ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষের গৃহে অরবিন্দ আবির্ভূত হন।

মনীষী ও মহাপ্রাণ সমাজনেতা রাজনারায়ণ বসুর কন্যা স্বর্ণলতাকে ডাঃ ঘোষ বিবাহ করেন। আর এই ঘোষ দম্পতির তৃতীয় সন্তানরূপে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট অরবিন্দ ভূমিষ্ঠ হন। অরবিন্দের মধ্যে মিলিত হয় মাতৃ ও পিতৃকুলের দুইটি সাংস্কৃতিক ধারা। একদিকে ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক রাজনারায়ণের প্রভাব, অন্যদিকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও জীবনধারার উগ্র সমর্থক ডাঃ কৃষ্ণধনের প্রভাব। এবারডীন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ডি. উপাধি নিয়ে ডাঃ ঘোষ দেশে ফিরে এলেন, কিন্তু কোন্নগরের রক্ষণশীল সমাজ জিদ ধরলো সমাজে স্থান পেতে হলে ওঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। প্রায়শ্চিত্ত করার পাত্র তিনি নন, অতএব লেগে গেলো দ্বন্দ্ব। ডাঃ ঘোষ রাগে তাঁর পৈত্রিক ভদ্রাসন নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করে চিরদিনের জন্য কোন্নগর ছাড়লেন।

ডাঃ ঘোষ তখন উত্তরবঙ্গে সরকারী কাজে রত। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে ঐ অঞ্চল তখন উজাড় হতে চলেছে। হাজামজা খালের সংস্কার অবিলম্বে দরকার, কিন্তু সরকারী বিলিব্যবস্থা এতো মন্থর যে, তার জন্য মুখ চেয়ে থাকা যায় না। ডাঃ ঘোষ বহু সহস্র টাকা দান করে ফেললেন এবং ঋণভার ও অর্থকষ্টের সম্মুখীন হলেন। মানব কল্যাণের জন্য তাঁর এই নিঃস্বার্থতা অরবিন্দের ভবিষ্যৎ-জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

কৃষ্ণধন ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষায় বিশ্বাসী। তাই অরবিন্দকে পাঁচ বছর বয়সে দার্জিলিং-এর এক ইংরেজী স্কুলে পাঠালেন। শুধু তাই নয়, অরবিন্দের বয়স যখন মাত্র সাত বছর, তখনই অপর দুই ভাইয়ের সঙ্গে ইংলণ্ডে পাঠানো হলো তাঁকে।

অসাধারণ প্রতিভা ও মেধা এই বালকের। বাল্যকালেই ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করলেন তিনি। তারপর ইতালীয় ও জার্মান ভাষায়। কেম্ব্রিজের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি পেলেন, ভর্তি হলেন কিংস্ কলেজে। ঐ বছরই অর্থাৎ আঠারো বছর বয়সে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। মেধাবী তরুণ ঐ পরীক্ষায় গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় প্রথম স্থান অধিকার করলেন। দু'বছর বেশ দক্ষতার সঙ্গে সিভিল সার্ভিসের শিক্ষানবিশী করলেন অরবিন্দ। কিন্তু অশ্বারোহণ পরীক্ষার দিন দেখা গেলো, তিনি অনুপস্থিত। সিভিল সার্ভিসের কাঠামোর মধ্যে এই মহাজীবনকে বন্দী করে রাখা গেলো না। তিনি এড়িয়ে চলে গেলেন। অথচ দুঃসাহসিক অরবিন্দের কাছে ঘোড়ায় চড়া একটা অতি তুচ্ছ ব্যাপার। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সিভিল সার্ভিসের শ্রীযুক্ত চারুদত্ত লিখেছেন : অরবিন্দ সেদিন আমার বাংলোয় এসেছেন। বারান্দায় বসে তখন বন্দুক নিয়ে হৈ-হল্লা হচ্ছে। অরবিন্দকে বন্দুক চালাবার জন্য আহ্বান জানানো হলো। অভ্যাস নেই বলে প্রথমটা তিনি কিছু আপত্তি করলেন। শেষে বন্দুক ধরলেন। অবশ্য সামান্য একটু দেখিয়ে দিতে হলো। তারপর তিনি বার বার লক্ষ্যভেদ করতে লাগলেন। লক্ষ্যবস্তু কি ? না,—দেশলাই-কাঠির ছোট্ট মাথাটা। ওরকম লোকের যোগসিদ্ধি হবে না তো কি তোমার আমার হবে ?

অরবিন্দ ভারতে ফেরেন বরোদা স্টেটের কাজ নিয়ে। মাতৃভাষায় জ্ঞান তাঁর তখন নিতান্ত নগণ্য। কিন্তু নিজের দেশ, নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে জানার অদম্য আগ্রহের জন্য তিনি অল্পকালের মধ্যেই ভারতাত্মার মর্ম উপলব্ধি করতে সমর্থ হলেন। প্রাচীন ভারতের কাব্য,

সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হলো। এগিয়ে চললো ভবিষ্যৎ দেশনেতা ও লোকগুরুর আত্মপ্রস্তুতি।

এসময় অরবিন্দ রামায়ণ ও মহাভারতের কিছু কিছু অংশ অনুবাদ করেছিলেন। সে-বার রমেশ দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে বরোদায় তাঁর সাক্ষাৎ হলো। তাঁর রামায়ণ ও মহাভারতের ইংরেজী অনুবাদ তখন বিলেতের প্রসিদ্ধ সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করেছে। কথা প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র অরবিন্দের অনুবাদ দেখতে চাইলেন। স্বভাবলাজুক অরবিন্দ অনেক পীড়াপীড়ির পর সেগুলি দেখালেন। দেখে রমেশচন্দ্র বলেছিলেন, আজ কেবল মনে হচ্ছে রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদে কেন আমি পণ্ডশ্রম করেছি। আমার দুঃখ হচ্ছে। সত্যি, আমি ছেলেখেলা করেছি।

গোড়ার দিকে অরবিন্দ বরোদা স্টেটে রাজস্ব বিভাগে কাজ করতেন। পরে শিক্ষাব্রত গ্রহণ করেন। ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা থেকে ক্রমে ভাইস্ প্রিন্সিপ্যালের পদে উন্নীত হন। এখানে থাকতেই মারাঠা কেশরী বালগঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্য হয় এবং এই সখ্য উত্তরকালে ভারতীয় মুক্তি-সংগ্রামকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

বরোদায় থাকাকালে অরবিন্দ বিবাহ করেন। তাঁর স্ত্রীর নাম মৃণালিনী দেবী। সংসারধর্মে তিনি কিন্তু চির উদাসীন ছিলেন। সহধর্মিণী মৃণালিনী স্বামীর ব্রত উদযাপনে সহায়তা করেন।

বরোদা-জীবনের শেষ পর্যায়ে অরবিন্দের মানসে এক সুস্পষ্ট বিবর্তন দেখা যায়। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ তাঁর ভবানী মন্দিরের পরিকল্পনা রচনা করেন। এ বিষয়ে একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করেন। স্থির হয়, দেশের দিকে দিকে মায়ের মন্দির স্থাপিত হবে, তার সঙ্গে থাকবে তরুণ কর্মযোগীদের আশ্রম। এই আশ্রমের কর্মীরা চারিদিকের জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবে এবং গঠনমূলক কাজে ব্রতী হবে। সেই সঙ্গে সামরিক সংগঠন ও যোগাভ্যাসও চলবে। প্রথমটায় নর্মদাতীরে গঙ্গোনাথ আশ্রমে, তারপর

কলকাতার মুরারিপুকুরের বাগানে এই শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। সে সময়ে গঙ্গোনাথ আশ্রমের গুরু ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। অরবিন্দ তাঁর দ্বারা বিশেষ অনুপ্রাণিত হন। তাঁর কৃপালাভও করেন। স্বামীজীর দেহত্যাগের পর তাঁর শিষ্য কেশবানন্দজীর সঙ্গেও অরবিন্দের ঘনিষ্ঠতা হয়। তাঁর ও দেশপাণ্ডে নামক এক সহযোগী বন্ধুর সাহায্যে ভবানী মন্দিরের কাজ চলতে থাকে। নর্মদা নদীর অপর পারে রাজপিপ্‌লা রাজ্যের ছারোডী শহরে সাথরিয়া বাবা নামে এক প্রসিদ্ধ যোগী ছিলেন। শোনা যেতো, সিপাহী বিদ্রোহের এক প্রাক্তন যোদ্ধা ছিলেন তিনি; দেশোদ্ধারের পরিকল্পনায় অরবিন্দ এ মহাপুরুষের আশীর্বাদ লাভ করেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ভারতের মুক্তি সংগ্রামের এক নূতন অধ্যায় উন্মোচিত করে। সারা ভারতবর্ষ এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে জেগে ওঠে। অরবিন্দও দেশের ডাকে সাড়া দিলেন এবং বরোদা ত্যাগ করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিক্ষোভ চঞ্চল বাংলার কর্মক্ষেত্রে। গোড়ার দিকে বাংলার যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়েছিলো, যার উদ্দেশ্য ছিলো ইংরেজ সরকার পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে জাতীয় আদর্শে শিক্ষাকে গড়ে তোলা,—তার অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করলেন অরবিন্দ। কিছুদিন পরেই কিন্তু তাঁর ডাক পড়লো, তিনি এগিয়ে এলেন সংগ্রামের পুরোভাগে। মুক্তিমঞ্চের পুরোধারূপে চিহ্নিত হলেন।

'বন্দেমাতরম' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতে লাগলো। অরবিন্দ হলেন তার সম্পাদক। তাঁর লেখনী নিঃসৃত বাণী দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করলো, মুক্তি সংগ্রামের চিন্তাধারায় এনে দিলো বিপ্লব। প্রকাশ্য সুস্পষ্ট ভাষায় অরবিন্দই প্রথম ঘোষণা করলেন পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ। নবীন ভারতের অন্যতম চিন্তানায়ক ও রাজনৈতিক নেতারূপে অরবিন্দের আবির্ভাব ঘটে।

সুরাট-কংগ্রেসের সজ্ঘর্ষে তিলক ও অরবিন্দের জয় ঘোষিত হয়

এবং তারপরই জাতীয় কংগ্রেসের রূপান্তর ঘটে। আত্মপ্রতিষ্ঠ সংগ্রামকালীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে শুরু হয় কংগ্রেসের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। অরবিন্দও প্রকাশ্য রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে এসে দাঁড়ালেন।

বলা বাহুল্য, বিটিশ রাজশক্তি এই শক্তিধর নেতাকে চূর্ণ করার জন্য সচেষ্ট হয়। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে বন্দেমাতরম পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধের জন্য সম্পাদক অরবিন্দকে জেলে যেতে হয়। সারা দেশময় এ নিয়ে চাঞ্চল্য পড়ে যায়। কবি রবীন্দ্রনাথ সেই সময়েই তাঁর প্রশস্তি গান করে বিখ্যাত কবিতায় লেখেন :

—অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার !

দ্বিতীয়বার তাঁকে গ্রেপ্তার করে বিখ্যাত আলিপুর বোমার মামলায় তাঁর বিচার আরম্ভ করেন ব্রিটিশ সরকার। প্রতিভাবলে কৌসুলী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বিচারের সময় অরবিন্দ সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'এই বিতণ্ডা, কোলাহল ও আন্দোলন স্তব্ধ হবার বহুকাল পরে এঁর অন্তর্ধানের দীর্ঘকাল পরে, মানবসমাজ এঁকে স্বদেশ প্রেমের মহাকবি, জাতীয়তার প্রবর্তক ও মানবপ্রেমিক বলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলে, এঁর তিরোধানের দীর্ঘকাল পরে এঁর বাণী, শুধু ভারতবর্ষে নয়, সাগরপারের দূরদূরান্তে ধ্বনিত হতে থাকবে।

উত্তরকালে চিত্তরঞ্জনের এই উক্তি সত্য হয়ে ওঠে। আলিপুর জেলে আটক থাকার সময় অরবিন্দের জীবনে এক অলৌকিক অনুভূতি আত্মপ্রকাশ করে। তিনি নিজে এর বর্ণনা দিয়েছেন : 'এইখানে এই ক্ষুদ্র ঘরের দেওয়ালটি আমার সঙ্গী, নিকটে আসিয়া ব্রহ্মময় হইয়া ইহা আমাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত। উদ্যানের দেওয়ালের গায়ে একটি বৃক্ষ ছিলো, তাহার নয়নরঞ্জক সবুজ লাবণ্যে প্রাণ জুড়াইতাম। ছয় ডিগ্রীর ছয়টি ঘরের সামনে যে সান্ত্রী ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার মুখ ও পদশব্দ ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো প্রিয় বোধ হইত। আলিপুরের নির্জন কারাবাসে আমি অপূর্ব প্রেম-শিক্ষা পাইলাম।'

তিনি আরও বলেছেন, 'তারপর তিনি আমার হাতে গীতা দিলেন। তাঁর শক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ করলো এবং আমি গীতার অনুসরণ করিতে সক্ষম হইলাম। আমাকে শুধু বুদ্ধি দিয়া বুঝিতে হয়নি, পরন্তু অনুভূতি ও উপলব্ধির ভেতর দিয়ে জানতে হয়েছিলো অর্জুনের কাছে শ্রীকৃষ্ণ কি চেয়েছিলেন···। যখন আমি

পদচারণা করতাম সেই সময় তাঁর শক্তি পুনরায় আমার মধ্যে প্রবেশ করলো। যে জেল আমাকে মানব-জগৎ হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে সেইদিকে আমি তাকাইলাম। কিন্তু দেখিলাম, আমি আর জেলের উচ্চ দেওয়ালের মধ্যে বন্দী নাই। আমাকে ঘিরিয়া রহিয়াছেন বাসুদেব।'

কংসের কারাগারে ভগবান্ বাসুদেব ভূমিষ্ঠ হন। আর সেদিন ইংরেজের বন্দীশালায় অরবিন্দের জীবনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সেই বাসুদেবের চৈতন্যময় সত্তা। কারাগারে অরবিন্দ যে বাণী শুনেছিলেন তার মধ্যে একটি হলো,—যখন তুমি বাইরে যাবে তোমার জাতিকে সর্বদা এই বাণীটি শোনাবে যে, সনাতন ধর্মের জন্যই তারা উঠছে, নিজেদের জন্য নয়—সমস্ত জগতের জন্যই তারা উঠছে। আমি তাদের স্বাধীনতা দিচ্ছি জগতের সেবার জন্য।

কারাগার থেকে মুক্তি পাবার পর অরবিন্দ কর্মযোগিন্ ও ধর্ম এই দুইটি সাপ্তাহিক পত্রিকার মাধ্যমে তাঁর আদর্শ প্রচার করতে থাকেন। বাইরে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লব, অন্তরের মধ্যেও তেমনি চলতে থাকে আর এক বিপ্লব। কিছুদিন পর কলকাতার চাঞ্চল্য থেকে সরে গিয়ে তিনি চন্দননগরে আত্মগোপন করেন। তারপর ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে পরামর্শের পর 'সি-আই-ডি'দের চোখে ধুলো দিয়ে উপস্থিত হলেন পণ্ডিচেরীতে। সেটা ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল। সেখানেই শুরু হয় তাঁর জীবনের অতি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। বাকি জীবন সেইখানে তিনি রইলেন এবং গড়ে তুললেন বিখ্যাত আশ্রম।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর সমাগত হয় শক্তিধর মহাপুরুষের মহাসমাধির লগ্ন। মরদেহ ত্যাগ করে অরবিন্দ দিব্যলোকে অন্তর্হিত হলেন। মুক্তির যে সাধনা প্রথম জীবনে তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, মানবাত্মার পরম মুক্তির পথে সেই সাধনারই সেদিন ঘটে মহা উত্তরণ। বঙ্কিম ও বিবেকানন্দই দেশ মাতৃকার মধ্যে সর্বপ্রথম দেবীত্বের আরোপ করেন। কিন্তু এই তত্ত্বকে জন-চৈতন্যে তুলে ধরেন অরবিন্দ। অরবিন্দের সাধনা স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয় —জগন্মাতা আর দেশমাতায় ভেদ নেই। রাজনীতিতে আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রয়োগের দিক দিয়ে অরবিন্দ অবতীর্ণ হন এক পথিকৃৎরূপে।